আদর্শ-চরিত।

কৃষ্ণমোহন।

"Our acts our angels are, or good or ill,
Our fatal shadows that walk by us still."

Beaumont and Fletcher

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

কলিকাতা।

১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯২।

১৪৮ নম্বর মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সাধন যন্ত্রে
শ্রীবিনোদবিহারী রায় দ্বারা
মুদ্রিত।

সূচনা।

'জীবনী' মানবের শ্রেষ্ঠতম সখা। ইহার নীতি মহদুপদেশময়, অন্তর নিয়ত পরহিতকামী। ইহার সহিত একবার সখ্যভাব জন্মাইলে, অন্তরে অন্তর মিশাইতে পারিলে, কি বিপদে, কি সম্পদে এ সখা নিয়ত ছায়ার ন্যায় অনুগামী থাকিবে, সতত সদুপদেশ দানে মনকে মহত্ত্বের অনুসারী করিবে। দারিদ্র্য দুঃখে নিমগ্ন হইলে এ সখা উদ্ধার হইবার পথ দেখাইয়া দিবে,— সন্তাপ-অনলে গ্রাস করিলে মুক্তির উপায় করিবে। ধনমদে মত্ত হইয়া বিপথে যাইলে ইহার লীলা বিভীষিকা দেখাইবে, অপব্যয় করিলে পরিমিত ব্যয়ের জন্য এ সখা হস্ত চাপিয়া ধরিবে। ফলতঃ জীবনীর ন্যায় সদুপদেষ্টা, সদুৎসাহদাতা ও মহত্ত্বের স্রষ্টা সদবন্ধু জগতে আর আছে কি না, জানিনা।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে কিন্তু এই হিতকামী জীবনীর সম্পূর্ণ অভাব। এ অভাবের প্রধান কারণ, বাঙ্গালী এখনও জীবনীর প্রকৃত হিতকরী মর্ম্ম বুঝেন নাই ও এদেশে জীবনী লিখনের উৎসাহ নাই। জীবনী লিখিতে যাইলে লেখকগণের প্রধানতঃ দুই প্রকারের উৎসাহ আবশ্যক করে। সে উৎসাহ দুইটির একটি সংগ্রহ-সাহায্য ও অপরটি অর্থোৎসাহ। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, বাঙ্গালাদেশে জীবনী-লেখকগণ এই দুই প্রকারের উৎসাহ হইতেই সর্ব্বথা বঞ্চিত আছেন। জীবনী-সংগ্রহের প্রধান উপায় স্বাখ্যায়িকা (Autc-biography) লিখন, কিন্তু এখানে সে স্বাখ্যায়িকা লিখিবার প্রথা নাই এবং লোকে আপন জীবন-কাহিনী সাধারণে প্রচার করিতেও তত অভিলাষী নন। তৎ-

পরে সংগ্রহের এ সকল অন্তরায়-ক্লেশ সহ্য করিয়াও যদি কেহ একখানি জীবন-চরিত লিখিলেন, নবেল-নাটক-পাঠী বাঙ্গালী তাহা (পড়া তো অন্য কথা!) ক্রয়ই করিলেন না। সুতরাং এত পরিশ্রম ও অর্থনাশ করিয়া জীবন-চরিত লিখিয়াও লেখককে সর্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত হইতে হইল।

জীবন-চরিত লিখিয়া এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হয় বলিয়াই বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ জীবনী লিখিতে তত ইচ্ছুক নহেন। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা জীবন-চরিত-ক্ষেত্রে একটু সুবাতাস বহিতেছে, বলিতে হইবে। পূর্ব্বে উৎসাহাভাবে একখানিও জীবন-চরিত দেখা যাইত না, কিন্তু আজ কাল উৎসাহ পাইয়া দুই একখানি জীবন-চরিত প্রকাশ পাইতেছে, এইটিই শুভচিহ্ন। "দ্বাদশ নারী" প্রচার করিয়া এই শুভচিহ্নের লক্ষণ আমাদের কতকাংশে অনুভূত হইয়াছে।

সেই অনুভাবনাই আজ আমাদের 'আদর্শ-চরিত' প্রণয়ণের সূচনা। মঙ্গলময় পরমেশ্বর করুন, আমাদের এ সূচনা যেন সূচনামাত্রেই বিলীন না হয়, সদুদ্দেশ্যে থাকিয়া, স্বর্গীয় পিতার উৎসাহ পাইয়া, আমরা যেন কৃষ্ণমোহনের ন্যায় আর আর মহাত্মাগণেরও 'আদর্শ-চরিত' প্রণয়ণ করিতে সক্ষম হই।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
৪০ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১২৯২ সাল।
মাঘ মাস,

আদর্শ-চরিত।

কৃষ্ণমোহন।

কঠিনা প্রকৃতি শুষ্ক বীজ বিচ্ছিন্নভাবে জগতে প্রক্ষেপ করিলেন। সে বীজ পার্ব্বতীয় বন্ধুর ভূমিতে পড়িয়া অঙ্কুরেই অকালে শুকাইয়া নষ্ট হইল, উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ সুদূস্তর মরুভূমে পড়িয়া ধূলি-আকারে মিশিয়া গেল, তরঙ্গমালা-শোভিত অকূল লবণময় সমুদ্র জলে জলীয়বাষ্পে বিলীন হইল, কেহ বা শাণিত প্রান্তভাগ কণ্টকে, কেহ বা প্রজ্বলিত বাড়বানলে জীবন বিসর্জ্জন দিল। কি হইল! তবে কি একটি জীবনও জীবন্ত রহিল না? রহিল। যাহারা আপনার প্রাণ আপনি বাঁচাইতে পারিল, তাহারা রহিল, যাহারা পার্ব্বতীয় কঠিন প্রস্তরে, চূর্ণ বিচূর্ণিত শরীরে, অসীম আয়াসে, আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিল—আপনার গন্তব্য পথ সজ্জনের নিকট দেখাইয়া লইল, তাহারা রহিল। মহাত্মা কৃষ্ণমোহন এইরূপে রহিয়া গিয়াছেন, আর যতদিন এই জগৎ রহিবে, তাঁহার নামও ততদিন রহিয়া যাইবে।

মহাত্মা কৃষ্ণমোহন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিয়াছিলেন। সে কুটীর অন্ধকারে পূর্ণ ছিল; সেখানে বিদ্যার জ্যোতিঃ প্রবেশ করে নাই—জ্ঞানের মনোমদ বিভা বিভাসিত হইতে পারে নাই। শিক্ষার প্রশস্ত পথ চিনিয়া লইবার

সেখানে কোন উপায় ছিল না—পথ প্রদর্শকের জন্য কোন সজ্জন পথ প্রদর্শককেও সেখানে দেখা যাইত না। সে কুটীর-বাসী সকলেই অন্ধকারে অন্ধ, সুতরাং কে আর প্রদর্শকের কার্য্য করিবে? অন্ধ কি অন্ধের প্রদর্শক হইতে পারে? কুটীর-বাসীগণ কেবল অন্ধ নহেন—তাঁহাদের শীর্ণদেহে আবার কঠিন প্রস্তরের চাপ। সে ভাবে তাঁহারা বড়ই ভারাক্রান্ত—উঠিতে নড়িতে পারিতেছেন না—সতত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে প্রস্তর কি?—দরিদ্রতা। কৃষ্ণমোহনের জীবন এই অন্ধকার গৃহে, এই রূপ দারিদ্র-প্রস্তর-চাপনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

অর্থের অভাব, উৎসাহ-দাতার অভাব, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন উচ্চবংশ পরম্পরার সহিত সম্বন্ধশূন্যতা; সংক্ষেপতঃ মানব-জীবন গঠনের সকল উপসর্গই কৃষ্ণমোহনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উন্নতির গতি রোধ করিতে পারে নাই,—তিনি আপনিই আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবন-বীজ এ সকল উপসর্গকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া সেই প্রস্তর চাপনের মধ্য হইতেই আপনার আঙ্কুরিক অবস্থার সম্প্রসারণ করিয়াছিল; সকল বিঘ্ন বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া, পথের কণ্টক দূরে ফেলিয়া, সে ক্ষুদ্র অঙ্কুর কালে ফলচ্ছায়াসমন্বিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল; আতপ-তাপিত ব্যক্তিকে ছায়াদানে, ক্ষুধিত জীবনকে ফলমূল দানে সে আপনার জনম-জীবন সার্থক করিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বিবরণ অতি শোচনীয়। তাঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যো-

পাধ্যায় রাঢ়িশ্রেণীস্থ দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। কুলীন ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ সে সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনেই জীবন-যাপন করিতেন। বিবাহ তাঁহাদের ব্যবসা ছিল; প্রধানতঃ তাঁহারা শৈশবেই বিবাহিত হইয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইতেন। জীবনকৃষ্ণের জীবনও বল্লালী সময় হইতে প্রচারিত এই সকল বিধিবদ্ধ নিয়মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। জীবনকৃষ্ণের জন্মভূমি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী, মহকুমা বারুইপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী নবগ্রাম। কিন্তু কুল-ক্রমাগত বিধিক্রমে জীবনকৃষ্ণের ভাগ্যে অধিক দিন জন্মভূমিতে বাস ঘটিয়া উঠে নাই; অতি শৈশবেই বিবাহিত হইয়া তাঁহাকে জন্মভূমি নবগ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতায় জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরালয়। তাঁহার শ্বশুরের নাম রামজয় বিদ্যাভূষণ (চট্টোপাধ্যায়)। রামজয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তাঁহার পরিণীতা পত্নী। ঠনঠনিয়ার অন্তর্গত বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে রামজয় বিদ্যাভূষণের বাসস্থান ছিল। নবগ্রামবাসী জীবনকৃষ্ণকেও বাল্যকাল হইতেই এই বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটবাসী হইতে হয়। তিনি পিতৃপোষ্যের পরিবর্ত্তে বাল্যকাল হইতেই শ্বশুরের পোষ্য হইয়াছিলেন, আত্ম-স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কৌমারেই প্রবাসিত্ব এবং পরান্ন-ভোজিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামজয় বিদ্যাভূষণ বিশেষ ধনশালী ছিলেন না। তিনি সাধারণ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বীয় যজমানী ব্যবসা হইতে একরূপ দুঃখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা ছিল না;

তখন সামান্য আয়েই সাধারণ গৃহস্থের সংসার একরূপে চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ তাৎকালিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সামাজিক বিদায় ইত্যাদিতেও কিছু কিছু প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের সংসার চালাইতে বর্ত্তমানের ন্যায় বিশেষ কষ্ট হইত না। রামজয় বিদ্যাভূষণ যোড়াসাঁকোর তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ধনী শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন—তাহাতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ আয় ছিল। এইরূপ নানা উপায়ে, বিজ্ঞ রামজয়ের বিস্তৃত সংসার কোনরূপে চলিয়া যাইত।

পৃথিবী নিয়ত স্বীয় কক্ষোপরি কেন পরিভ্রমণ করিতেছেন? ভ্রান্ত মানব! তাঁহার এরূপ ঘূর্ণনের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিয়াছ কি? উন্নতোন্মুখ শিক্ষিত যুবক! তুমি হয় তো বলিয়া বসিবে "এ কি আবার নূতন প্রশ্ন? বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়, তাহা তোমায় এ প্রশ্ন তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিবে।" কিন্তু আমি বলি, তাহা নহে। এ ঘূর্ণন জীব জগতের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি চালাইতেছে। এ ঘূর্ণনে ধনী দরিদ্র হইতেছে, এ ঘূর্ণন দরিদ্রকে ধনবান করিতেছে। এ ঘূর্ণনের মূল সত্য,—জীব জগতের পরিবর্ত্তন; এ ঘূর্ণনের মূল সূত্র,—সংসারে বিভ্রাট আনয়ন। এই ঘূর্ণন জীবনকৃষ্ণের জীবনে বিভ্রাট আনয়ন করিল। তিনি স্বয়ং পরাশ্রয়ী ও পরান্ন-ভোজী; কিন্তু বিচিত্রময়ী পৃথিবীর এই বিচিত্র ঘূর্ণনে আবার তাঁহাতেও জীব আশ্রয় লইতে লাগিল; শ্বশুরালয়ে কিছু দিন বাস করিতে করিতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহারও সন্তান সন্ততি জন্মিল। ক্রমে রামজয়ের গৃহে, শ্রীমতীর গর্ভে

জীবনকৃষ্ণের তিনটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহার পুত্র তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; মধ্যম আমাদের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং কনিষ্ঠের নাম কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কন্যা দুইটির মধ্যে একটির অতি শৈশবে মৃত্যু হয় এবং অপরটি শিবনারায়ণ দাসের গলিনিবাসী হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিণীতা হন। অধুনা তাঁহার গর্ভজাত পুত্র শ্রীযুক্ত মন্নুলাল চট্টোপাধ্যায় বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

এইবারে রামজয় বড় বিপদে পড়িলেন। দিনের পরিবর্ত্তনে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দৌহিত্র পৌত্রাদিতে সংসার পরিবারপূর্ণ হইয়া আসিল; কিন্তু তাঁহার আর আয় বাড়িল না—সংসার চালান কষ্টকর হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি পরিবারসংখ্যার ন্যূনতাকল্পে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার জামাতা প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে কৌশলে স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন।

এই কৌশলে জীবনকৃষ্ণকেও শ্বশুরালয় ত্যাগ করিতে হইল। এত দিন তিনি শ্বশুরের স্কন্ধে সংসার-ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহার মস্তকে সাংসারিক গুরুভার পতিত হইল। রামজয় তাঁহাকে ঠনঠনিয়াপল্লীস্থ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে একটু সামান্য ভূমিদান করিলেন এবং তাহাতে তাঁহাদের বাসোপযোগী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অগত্যা জীবনকৃষ্ণকে রামজয়-ভবন ত্যাগ করিয়া ঐ নূতন বাটীতে বাস করিতে হইল। পরদুঃখ-

কাতর সহৃদয় পাঠক পাঠিকে। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "নূতন বাটীতে আসিয়া জীবনকৃষ্ণের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ কিরূপে চলিতে লাগিল?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রধানতঃ জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, তাঁহার কুলোচিত ভিক্ষাবৃত্তি, শ্বশুর প্রদত্ত সাহায্য এবং শারীরিক পরিশ্রম। ফলতঃ জীবনকৃষ্ণের সংসার এই তিন উপায়ে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা পতিপত্নী অর্দ্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে থাকিয়া অতি কষ্টে সন্তান কয়েকটিকে পালন করিতে লাগিলেন। এই সন্তান কয়েকটিই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভরসা—অন্ধের এক-মাত্র অবলম্ব্য যষ্টি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে মুসলমানগণের প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইল, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল জ্বলি-যাই মহারাষ্ট্র-জ্যোতিঃ নিভিয়া গেল, আর ইন্ধনাবৃত ধূমপূর্ণ তুষাগ্নির ন্যায় ব্রিটিশ-বীর্য্য দিগন্ত প্রসারিত হইল। ক্রমে ঊণবিংশ শতাব্দীর কৈশোর যাইল, কৌমার কাল আসিল, ভারতে ব্রিটিশ-প্রতাপও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে, রামজয়ের গৃহে মহাত্মা কৃষ্ণ-মোহন জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের (১২২১ সালের) বৈশাখ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। এই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা মহাত্মা লর্ড মিণ্টো ভারত ত্যাগ করেন; এই সময় আমাদের মহারাজা তৃতীয় জার্জ্জ, নেপো-লিয়ন বোনাপার্টির সহিত ঔপদ্বীপিক যুদ্ধে (Peninsular War এ) লিপ্ত ছিলেন; এই সময়ে এই ঔপদ্বীপিক যুদ্ধ লইয়া সমগ্র

ইউরোপে তুমুল হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এই খৃষ্টাব্দেই কালের বিচিত্র গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহাত্মা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন "দুই দিন পূর্ব্বে যে ইউরোপ আমার সহকারী বন্ধু ছিল, আজ কালের কুটিল গতিতে সেই ইউরোপ আমার বিপক্ষে শত্রুত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" কালের এই অশান্তিপূর্ণ পরিচ্ছেদে—ইতিহাসের এই বিচিত্রময় অধ্যায়ে ভারত মাতা একটি রত্নলাভ করিয়া ক্ষণকালের জন্য শান্তিসুখে সুখী হইয়াছিলেন। সে রত্ন—এই কৃষ্ণমোহন।

কৃষ্ণমোহনের বাল্যজীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—সে জীবনের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। তবে আমরা অনুসন্ধানে যতদূর প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠকগণকে তাহাই জানাইয়া পরিতৃপ্ত হইব। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার নামক একজন সহৃদয় ইংরাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহার জীবন ভারতবাসীর উন্নতি কামনায় সতত নিয়োজিত ছিল। তিনি ভারত-সন্তানগণকে উন্নত করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে আপনাকে সতত ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের সাহার্য্যাকল্পে প্রণোদিত হইয়া তিনি কলিকাতায় অনেকগুলি পাঠশালা ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালা এবং বিদ্যালয়ে দীন দরিদ্রের সন্তানগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের নিয়ম ছিল। তাঁহার সংস্থাপিত পাঠশালার মধ্যে ঠনঠনিয়াস্থ কালিতলার পাঠশালাটি অন্যতম। দরিদ্র সন্তান কৃষ্ণমোহন ছয়বর্ষ বয়সে যথাবিধি হাতে খড়ি দিয়া হেয়ার সাহেবের স্থাপিত এই পাঠশালায় প্রথম প্রবেশ করেন। তাহার জননী শ্রীমতী সম-

ধিক বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহারই যত্নে কোনরূপে কৃষ্ণমোহনের পাঠশালার পাঠ চলিতে লাগিল।

পতিতপ্রায় বৃক্ষ অবলম্বন পাইয়াছে। আর তাহার উন্নতির গতি কে রোধ করিবে? দিন দিন কৃষ্ণমোহনের হৃদয় বিদ্যার জ্যোতিতে পূর্ণ হইতে লাগিল, "বিদ্যাহি পরমং ধনং" দিন দিন এই অমৃত নিঃসারিণী নীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আসিল, তাঁহার হৃদ্বেগ দিন দিন এই নীতির অনুসরণে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে তিন চারি বর্ষের মধ্যে তাঁহার পাঠশালার পাঠ সমাপন হইল, পাঠশালার পরীক্ষায় তিনি প্রধানতম ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে (১২৩০ সালে) কৃষ্ণমোহন দশম বর্ষে পদার্পণ করেন। এই সময় তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়, তিনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া হেয়ার সাহেবের স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আর এই বর্ষে কৃষ্ণমোহনের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা এই যে, তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যত্ন এবং একাগ্রতায় মুগ্ধ হইয়া "কলিকাতা স্কুল সোসাইটি" তাঁহার পাঠব্যয় আপন স্কন্ধে বহন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণমোহনের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের এবং কলিকাতা স্কুল সোসাইটি হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির এই অব্দ ভারত ইতিহাসে আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা লর্ড আমহার্ষ্ট মহোদয়ের ভারতাগমন অব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অব্দ হইতে কৃষ্ণমোহনের যশজ্যোতিঃ ক্ষীণাকারে প্রকাশ পাইতে থাকে; এই অব্দ হইতে তিনি শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রিয়পাত্র মধ্যে

গণ্য হইতে থাকেন, তাঁহার বিদ্যানুরাগিতা ও সচ্চরিত্রতা এই সময় হইতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে।

এক বর্ষকাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের (১২৩১ সালের) ফেব্রুয়ারি মাসে, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কৃষ্ণমোহন "হিন্দু কালেজে" প্রবিষ্ট হইলেন। এখানেও তাঁহার বেতন লাগিত না। তিনি আপনার একান্ত যত্ন এবং অধ্যবসায়ে, সাধারণ ছাত্রের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, হিন্দু-কালেজের অবৈতনিক ছাত্র হইয়াছিলেন। শিক্ষার একান্ত চেষ্টা এবং অনুরাগ থাকিলে, এইরূপেই অবলম্বন যুটিয়া যায়।

যাহাহউক, এ সময়ে জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ? কিরূপেই বা তাঁহার সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হইতেছে? এ সময়েও জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ শোচনীয়। বলিতে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে যে, এ সময়েও এক মুষ্টি অন্নের জন্য কৃষ্ণমোহনের জননীকে নীচলোকের ন্যায় চরকায় সূতা কাটিতে হইত—যজ্ঞোপবীত বিক্রয় করিতে হইত। আর বলিব কি! পোড়া পেটের দায়ে, সামান্য অসভ্যজনোচিত পরিশ্রমে, প্রচলিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ সতত অর্থের চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁহাদের জীবন কেবল যেন জগতে কাঁদিতে আসিয়াছিল, তাই তাঁহারা সতত পুত্রাদির আহারের ভাবনা ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইতেন। ক্রন্দনই দরিদ্রের অসময়ের সম্বল। কৃষ্ণমোহনের দরিদ্র পিতা মাতাকেও সতত এই ক্রন্দন সম্বলে থাকিতে হইয়াছিল।

এত কষ্টে পড়িয়াও কিন্তু একদিনের জন্যও কৃষ্ণমোহনের মতি বিচলিত হয় নাই। বিদ্যার প্রতি তাঁহার সেই দৃঢ় অনুরাগ, সেই একান্ত অধ্যবসায় এত কষ্টে পড়িয়াও অটুট ছিল। তাঁহার এই বিদ্যানুরাগের, বিপুল অধ্যবসায়ের যে সকল দৃষ্টান্ত জগতে রহিয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ভ্রান্ত-জীবন! যদি একবার এই সকল স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত হৃদয়ে স্থান দেও, তবে তোমার সকল ভ্রম দূরে যাইবে, তোমার পক্ষে সকল দ্রব্যই অনায়াস-লব্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। কৃষ্ণমোহনের পিতা মাতা সতত অন্নের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন, সুতরাং স্কুলের সময়ে অন্ন পাওয়া কৃষ্ণমোহনের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইত। কিন্তু প্রথমতঃ কৃষ্ণমোহন সে কষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি অর্দ্ধেক দিন অনাহারেই বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইতেন। ক্রমে তাঁহার এ অনাহার-কষ্ট প্রবল হইল—তাহা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার হানিকর হইয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহন আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না, দেখিলেন, এরূপ ভাবে চলিলে শীঘ্রই তাঁহার দেহ জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সুতরাং তিনি এই সময় হইতে জীবন রক্ষা এবং বিদ্যাশিক্ষা এই উভয়ের উপযোগী এক প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিলেন। স্কুল হইতে আসিয়া বৈকালে এবং রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একচিত্তে আপনার পাঠাভ্যাসে রত থাকিতেন। এ সময়ের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বা আলাপ পরিচয় পর্য্যন্তও করিতেন না। এমন কি। এ সম্বন্ধে কোন দুষ্ট লোক যদি তাঁহাকে কোনরূপ বিদ্রূপ করিত, তাহা হইলে তিনি অন্তর খুলিয়া

উত্তর দিতেন "দিন পাইলে লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব। এখন বিদ্যাশিক্ষাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তুচ্ছ আমোদে আমার কাজ কি? বিজ্ঞ লোকে এরূপ আমোদেও বিদ্রূপ করিবে যে।"

দশ ঘটিকার পর হইতে কৃষ্ণমোহন বিদ্যালয়ে থাকিতেন; বৈকাল ও রাত্রি তাঁহার পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত হইত। কিন্তু প্রাতঃকালে কৃষ্ণমোহন সংসারের একটি কঠোর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সে কার্য্য কি? পোড়া লেখনীকে এ কথাও সাধারণে প্রচার করিতে হইবে? এ কথা যে বড় মর্ম্মভেদী। এ কথা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু না বলিলে যে কর্তব্য রক্ষা হইবে না। বলিব বটে, কিন্তু লোকের কি একথা স্মরণ থাকিবে? লোকে যদি এ কথা স্মরণ রাখিতে পারে, তবে এ কথায় জগতের বিশেষ উপকার দর্শিবে—এ কথায় লোকে মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। কৃষ্ণমোহন শয্যা ত্যাগ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, তৎপরে রন্ধন গৃহাদি পরিষ্কার করণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ইহার পর স্নান করিয়াই তাঁহাকে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইত। তাঁহার পিতা মাতা সতত অন্নের ভাবনাতেই ব্যস্ত, প্রাতঃকালিক রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে তাঁহাদের সে অন্ন-সংস্থানে ব্যাঘাত পড়িত। সুতরাং কৃষ্ণমোহন আর এ কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য লইতেন না। আপনিই যাহা পারিতেন, তাহাই যথেষ্ট বোধ করিতেন।

এ রন্ধন কার্য্য ব্যতীতও কৃষ্ণমোহনের প্রাতঃকালে আর একটি কার্য্য ছিল—সেটি তাঁহার মাতুলালয়ে বিগ্রহ-পূজা।

রন্ধন-কার্য্যের পূর্ব্বে, স্নান করিয়াই তিনি রামজয় বিদ্যাভূষণের বাটীতে নারায়ণ পূজা করিতে যাইতেন। ইহাতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, নৈবেদ্য পূজোপকরণ তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহাতে প্রায়ই তাঁহার প্রাতঃকালিক অন্নের সংস্থান হইয়া যাইত।

কৃষ্ণমোহন কেবলই যে, প্রাতঃকালে এই রূপ গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহাও নহে। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এ সময়েও তিনি আপনার পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিতেন না। রন্ধনসময়েও তিনি আপনার পাঠ্য পুস্তক সকল নিকটে লইতেন—রন্ধন-কার্য্য করিতে করিতেও, এক একবার অবসরক্রমে আপনার পুস্তক পাঠ করিতেন। বিদ্যার প্রতি এরূপ অনুরাগ অতি অল্পলোকেরই দেখা গিয়া থাকে। যাঁহাদের দেখা যায়, তাঁহারাই এ জগতে মহৎ নামের বাচ্য।

প্রথম ব্রহ্ম বিগ্রহের (First Barmise War এর) অবসান হইল. ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসক মহাত্মা আমহার্ষ্ট ভারত ত্যাগ করিলেন, পতিত ভারত মহাত্মা বেণ্টিকের শুভাগমন সম্ভাষণ করিয়া লইল। এই অব্দে কৃষ্ণমোহনের জীবনে একাধারে হর্ষ বিষাদের উদয় হইয়াছিল; একপক্ষে এই অব্দে যেমন তাঁহার শোক দুঃখের অবধি ছিল না, অন্য পক্ষে এই অব্দে আবার তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়াছিল। এই কাল খৃষ্টাব্দে দরিদ্রাবস্থাতেই, দরিদ্রতার কঠোর পীড়নে, তাঁহার দরিদ্র পিতার জীবন বায়ুর অবসান হইয়াছিল,—উন্নতোন্মুখ যুবকপুত্রের সম্মুখে "আর কষ্ট সহ্য

হয় না ” বলিয়া এই অব্দে জীবনকৃষ্ণ জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? এ শোক তাঁহার কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মস্পর্শী! আর এ অব্দে তাঁহার আনন্দের কারণ,—তিনি হিন্দুকালেজের পরীক্ষায় সর্ব্বোন্নত ছাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবৃত্তি এ অব্দে তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, এই অব্দ হইতে তাঁহার যশোভাতি প্রশস্ত আকারে সাধারণে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

জীবনকৃষ্ণের মৃত্যুর পরই তাঁহার পতিত সংসার সময়-স্রোতে ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা যাইল না—পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার অবলম্বন হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহনের একটি কর্ম্ম যুটিল। দারিদ্র্য-পীড়নে ভুবনমোহন সম্যকরূপ বিদ্যালোচনা করিতে পারেন নাই, অবলম্বন অভাবে বাল্যেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগে সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। পিতার পরলোকে এ সময় হইতে তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে আরও দৃঢ়রূপে নিযুক্ত হইতে হইল। তিনি কলিকাতার তাৎকালিক বিচারালয়ে * মকর্দ্দমার আরজী লিখিয়া অতি ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে এই সময় বঙ্গগৃহে বিষম ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কৃষ্ণমোহনও সে আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁহার এ আন্দোলনে যোগদানের মূল—ডিরোজিও সাহেব।

---

* এই বিচারালয়কে “কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট” (Court of Request,) বলিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা “ছোট আদালত” নামে অভিহিত।

ডিরোজিও ফিরিঙ্গি-সন্তান। এ সময়ে তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষক। ডিরোজিও, ফিরিঙ্গি-সন্তান হইলেও, হিন্দু-সন্তানগণকে সমধিক শ্রদ্ধা ও মান্য করিতেন। তাঁহার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মান্য অচিরে কৃষ্ণমোহনপ্রমুখ যুবকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, অল্প দিবসের মধ্যে নব্য হিন্দু-যুবকগণ ডিরোজিওর সহকারী সঙ্গী হইতে লাগিলেন।

ডিরোজিওর সহবাস হিন্দু-সমাজে যে কি ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিল, তাহা বলিবার নহে। একে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, ইতিহাস বিজ্ঞানের নবালোকে নবোত্থিত যুবক-মণ্ডলীর মন প্রাচীন হিন্দু সামাজিকতার উপর হীনশ্রদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে আবার এই মহা প্রলয়ঙ্কর *ডিরোজিওর সংস্রব। এ সংস্রব জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান* করিল, বালুকারোধী নদীর গতি প্রসারিত করিয়া দিল। যুবকগণ প্রশস্ত মনে, নির্ভীক চিত্তে সামাজিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন, কৌলিন্য-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন, শুক্রবিক্রয় নিবারণ, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের প্রতিবন্ধকতা আচরণ এ সময়ে তাঁহাদিগের আলোচ্য কার্য্য হইয়া আসিল।

এই যুবকগণের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতিই প্রধান। ডিরোজিওর সংস্রবে, এই সকল নব্য যুবকদলের উদ্যোগে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। যুবকগণ সভা সমিতি করিয়া, সংবাদপত্রে লিখিয়া,

প্রকাশ্যভাবে সামাজিক কুসংস্কার সমূহের মূলোৎপাটনে দৃঢ়-ব্রত হইলেন। এই যুবকগণের উদ্যোগে মানিকতলায় * (১৮২৮ কি ২৯ খৃষ্টাব্দে) "একাডেমিক এসোসিয়েসন" নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইল। এ সভা স্থাপনেরও প্রধান উদ্দেশ্য, সামাজিক কুপ্রথা সমূহের উচ্ছেদসাধন। এ সভার অনেক মান্য গণ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্মীলন হইত। এ সভায় ডেভিডহেয়ার, বায়ান এবং বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী বেনসন প্রভৃতিরও বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

জীবনকৃষ্ণের মৃত্যুর এক বৎসর পরে কৃষ্ণমোহনের হিন্দু-কলেজের পাঠ শেষ হইল। তিনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের (১২৩৭ সালের) নবেম্বর মাসে হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার প্রিয়বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এ সংযোগও তাঁহাদের স্বাধীন মত প্রচারের বিশেষ সহায় হইল। এই সময় ভারতের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল। একদিকে যেমন হিন্দু-যুবকগণ সামাজিক কুসংস্কার সমূহের উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রাজ-দরবারেও হিন্দুদিগের কুসংস্কার দূরীকরণে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই খৃষ্টাব্দে মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগে ভীষণ সতীদাহ-নিবারণ-প্রথা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল,—ঠগী-উৎসাদন প্রভৃতির আন্দোলন চলিতেছিল।

* বর্ত্তমান সময়ে ঐ বাটিটি ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অধিকৃত। ইতিপূর্ব্বে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীনস্থ জমীদার-সন্তানগণ ইহাতে বাস করিতেন।

দেখিতে দেখিতে এইরূপ সামাজিক আন্দোলনে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল; ক্রমে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ আসিল। এই খৃষ্টাব্দ কৃষ্ণমোহনের জীবনে যে কঠিন শেল নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। এই খৃষ্টাব্দে ঘটনাচক্র তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল; তাঁহার অন্নের সংস্থান কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে প্রবাসিত্ব এবং পরান্নভোজিত্ব গ্রহণ করাইয়াছিল। এই খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট কৃষ্ণমোহনের জীবনের একটি শোচনীয় দিন। এইদিন কৃষ্ণমোহন হেয়ারস্কুলে পড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণমোহনের নিকট গতায়াত করায়, পরিচিত থাকায়, তাঁহাদিগকে বাটীর ভৃত্য বাহির গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। তাঁহারা গৃহে বসিয়া নানারূপ আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময় কৃষ্ণমোহনের বাটীর উত্তর-পার্শ্ব-সংলগ্ন বাটীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; তিনি প্রচলিত কালোচিত হিন্দু রীতি নীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নব্যদলের নূতন মত তাঁহার নিকট ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইত, তিনি সর্ব্বদা যুবকদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিবার জন্য সামাজিক দল বাঁধিতে চেষ্টিত হইতেন। এইদিন যুবকগণ সেই বৃদ্ধের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের চপল স্বভাবোচিত অত্যাচারে বঙ্গগৃহ কলুষিত হইয়া উঠিল। যুবকগণ অস্পর্শীয় গোমাংস ও গোহাড় সমূহ উক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে নিক্ষেপ করিয়া "ঐ গোহাড়! ঐ গোমাংস!" শব্দে চীৎকার

করিতে লাগিলেন। সে চীৎকার শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইলেন,—কম্পান্বিত দেহে, ম্লানবদনে হিন্দু-সমাজের সহায় লইলেন। সে সহায়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিল। শত শত হিন্দু একত্রে মিলিয়া যুবকগণকে আক্রমণ করিলেন—পল্লী ঘোর রোলে ধ্বনিত হইল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহন বাটী আসিলেন, বাটী আসিয়া দেখিলেন, বাটী লোকে পরিপূর্ণ—সেখানে কেবল 'মার' 'মার' শব্দ।

কৃষ্ণমোহনের গৃহাগমনের পরই বিবাদ মিটিল। ক্ষণকাল মল্লযুদ্ধের পর নব্য যুবকগণ পলাইলেন; আর হিন্দুগণ ভুবনমোহনের কর্ম্মস্থান হইতে আগমন প্রতীক্ষায় পথ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। "হয় কৃষ্ণমোহনকে সমাজচ্যুত ও গৃহত্যাগী করিব, না হয় উপদ্রব করিয়া সমগ্র পরিবার বিধ্বস্ত করিব" এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা পথে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এমন সময় ভুবনমোহন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন দেখিয়া, হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন; আনুপূর্ব্বিক দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বলিলেন, "আপনি যদি মঙ্গল কামনা করেন, তবে কৃষ্ণমোহনকে এই দণ্ডেই বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন, নতুবা আপনাদের আর রক্ষা নাই।" ভুবনমোহন আর কি করিবেন? সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে কথা কহেন, তাঁহার সাধ্য কি? সুতরাং অগত্যা সমাজপতিগণের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন; বাটী আসিয়াই কৃষ্ণমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই। হয় তুমি বাটী হইতে বহিষ্কৃত হও, নতুবা আমাকে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। হিন্দু-সমাজ তোমার প্রতি

বিশেষ কষ্ট; তুমি বাটী হইতে না বাহির হইলে তাহারা এ সংসারে বিষম বিভ্রাট ঘটাইবে।” কৃষ্ণমোহন আর কথা কহিলেন না; জ্যেষ্ঠের আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ম্লান মুখে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

নিঃসম্বলে গৃহত্যাগী হইয়া কৃষ্ণমোহন একদিন আশ্রয় পাইলেন না,—সে দিন তাঁহার অনাহারে পথে পথে কাটিয়া গেল। পরদিন কোন সহৃদয় ইংরাজ তাঁহাকে আপন বাটীতে স্থান দিলেন; কৃষ্ণমোহন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া মনকষ্টে আপনার কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজাতি-চ্যুতি-কষ্ট তাঁহার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল। এইরূপে গৃহত্যাগী হইয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে কৃষ্ণমোহন পীড়িত হইলেন। সে পীড়ায় তাঁহার বাঁচিবার কোনই আশা ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ও তাঁহার বন্ধুগণের যত্নে তিনি সে পীড়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এই সময় ডফ প্রভৃতি খৃষ্ট-যাজকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল; নিরাশ্রয় দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগী করিয়াও হিন্দুসমাজ কিন্তু স্থির রহিলেন না; তাঁহাকে ব্যথার উপর ব্যথা প্রদান তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। গৃহত্যাগের একমাস যাইতে না যাইতে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বরে) একদল হিন্দু একদিন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণমোহন অতি কষ্টে এ আক্রমণের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাইলেন,—এ আক্রমণেও হিন্দু-সমাজ তাঁহার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না।

ক্রমে আরও দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের উৎপীড়ন কমিল না। এবার হিন্দু-সমাজ কৃষ্ণমোহনের কর্ম্মচ্যুতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা হেয়ার সাহেবকে গিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণমোহনকে শীঘ্র আপনার বিদ্যালয় হইতে দূর করিয়া দিউন,—না দিলে আমরা আর সন্তানগণকেও বিদ্যালয়ে যাইতে দিব না।" হেয়ার সাহেব এ কথায় কিছু শঙ্কিত হইলেন; অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অসহায় কৃষ্ণমোহনের একমাত্র অন্নের সংস্থানও এই রূপে নষ্ট হইল,—কৃষ্ণমোহন এতদিনে ভিখারীপ্রায় হইলেন।

এ সময় ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল বেগ। যে বেগ কয় বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র শ্রীরামপুরে দৃষ্ট হইয়াছিল, আজ কালের বিচিত্র ঘূর্ণনে তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিতপ্রায়! কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক হিন্দু ক্ষোভে ও মনোদুঃখে প্রকাশ্যভাবে সে বেগে ভাসমান হইলেন। কলিকাতায় এ সময় ডফ সাহেব একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক। তিনি অনেক দিন হইতে কৃষ্ণমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে ছিলেন। এ সময় আবার কৃষ্ণমোহনের পরম বন্ধু, ডিরোজিওর অন্যতম সহকারী মহেশচন্দ্র ঘোষ ডফ-পৌরহিত্যে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কৃষ্ণমোহন একে নিরাশ্রয়, তাহাতে আবার মনোদুঃখে জর্জ্জরিত, একে তিনি হিন্দু-সামাজিকতার বিরুদ্ধবাদী, তাহাতে আবার তাঁহার এই দুরবস্থা!

সমাজ হইতে পরিত্যক্ত, আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য কৃষ্ণমোহন আর বারিহীন মরুতে কত দিন থাকিবেন? এ অবস্থায় ডফের চিত্তমুগ্ধকারী ধর্ম্মকথা তাঁহার মন আকর্ষণ করিল। অগত্যা ডফ পৌরহিত্যে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ডফ-ভবনে * বহুসংখ্যক ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্মুখে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার এই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের দিন—১৮৩২ খৃষ্টাব্দের (১২৪০ সালের) ১৭ই অক্টোবর (?) ‡। এই দিন ভারতের একটি জলন্ত নক্ষত্র ভারতাকাশ হইতে স্খলিত হইয়াছে, এই দিন ভারতমাতার একটি প্রকৃত পুত্র অসহায়ে, নিরাশ্রয়ে সনাতন আর্য্যধর্ম্মচ্যুত হইয়া ম্লেচ্ছধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়?

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমোহন আশ্রয় পাইলেন। এই খৃষ্টাব্দে 'লণ্ডন মিসনারী সোসাইটীর' উদ্যমে মৃজাপুর পল্লীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সহৃদয় খৃষ্টান-সমাজ কৃষ্ণমোহনকে সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অসহায় কৃষ্ণমোহনের ইহাতে কিঞ্চিৎ আয় হইতে লাগিল—তিনি অদূরে উন্নতির ক্ষীণ জ্যোতি দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে হাবড়া-নিবাসী রাধা-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিন্দুবাসিনী নাম্নী কন্যার সহিত কৃষ্ণমোহনের পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। খৃষ্টান হওয়ার পর বিন্দুবাসিনীকে বাসায় আনয়নের চেষ্টা পাওয়ায়

* মৃজাপুর ষ্ট্রীটের এই বাড়ী বর্ত্তমানে ঘোষাল পরিবারের অধিকৃত।

‡ নববার্ষিকীতে লিখিত আছে, ডিসেম্বর মাস।

রাধামোহন কন্যাকে কৃষ্ণমোহনের নিকট পাঠাইতে অস্বীকৃত হইলেন, কৃষ্ণমোহনকে পুনবায বিবাহ কবিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণমোহন কিন্তু তাহা পাবিলেন না। যে বহু বিবাহ প্রভৃতিব প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও আত্মীয স্বজন হইতে ভ্রষ্ট কবিয়াছে, তাঁহাব প্রাণ থাকিতে তিনি স্বয়ং তাহাব পোষকতায কেমন কবিয়া নীচতার দৃষ্টান্ত হইবেন? বিন্দুবাসিনীও স্বামী ত্যাগ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না। বুদ্ধিমতী বিন্দুবাসিনী পিতাব অজ্ঞাতে, গোপনে গোপনে স্বামীকে স্বাভিপ্রায জ্ঞাপন কবিলেন। পত্নীর মনোভাব জানিতে পাবিযা কৃষ্ণমোহন অগত্যা বিচাবালয়ের আশ্রয লইলেন। হাবডাব আদালতে, বিচাবে তাঁহাব জয় হইল, তিনি বিন্দুবাসিনীকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণমোহনেব এখন অদৃষ্টেব গতি ফিবিযাছে। এখন সৌভাগ্য-স্রোত তাঁহাব অনুকূলবাহী। মৃজাপুরেব বিদ্যালযে পঞ্চ বর্ষকাল অধ্যক্ষতা কবিতে কবিতে, চেষ্টা ও অধ্যবসায়েব গুণে তাঁহাব পদেব উন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্টান-সমাজে তাঁহাব মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িযা আসিল। এমন কি,—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (১২৪৫ সালে) তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেব পদে উন্নীত হইলেন। ধর্ম্ম যাজকেব পদে বরিত হইলে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, বেথুন স্কুলের দক্ষিণে একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দিব প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণমোহন সেই ধর্ম্মালয়ের আচার্য্য হইলেন; ধর্ম্ম-মন্দিব সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য তাঁহাবই তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম্ম-মন্দির অধুনাপি "কৃষ্ণ বন্দ্যোব গির্জ্জা" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

এত বিপ্লবেও কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বিদ্যানুরাগ বিলুপ্ত হইল না; এখনও তিনি অদম্য উৎসাহে বিদ্যার সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন। বাঙ্গালী, সাধারণতঃ কর্ম্মকাজ যুটিলেই লেখা পড়া ত্যাগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের জীবনে সে ঘটনা ঘটিতে পাইল না, তাঁহার শৈশবোচিত বিদ্যানুরাগ অটুট রহিল। সংবাদপত্রে লেখা কৃষ্ণমোহনের আশৈশবিক জল্পনা। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ "পার্থেনো" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তেজবীর্য্যপূর্ণ স্বাধীন ভাবসমূহের সমাবেশ দেখিয়া হোরেশ উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর কৃষ্ণমোহন 'হেস্পারস' (Hesperus) প্রভৃতি আরও দুই একখানি ইংরাজী পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে, হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার সময়ে "এনকোয়েরার" (Enquirer) নামে অপর একখানি ইংরাজী পত্র স্বয়ং সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। এ পত্রও হিন্দু-কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধবাদী অনেক তেজস্বী প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত।

স্বদেশ ও স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিযাও কৃষ্ণমোহন একদিনের জন্য জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষকাল ধর্ম্মযাজকের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের পর এই ১৫ বৎসরের মধ্যে অকল্যাণ্ড, এলেন্‌বরা, হার্ডিঞ্জ

এবং ডালহৌসী ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরাল হইয়া আগমন করেন। এ সময় বঙ্গভাষার অতি দুরবস্থা, বঙ্গভাষা এ সময় সহায়হীনা। অকল্যাণ্ড-শাসন হইতে কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টি সেই পতিত বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব-সাধনে প্রধাবিত হইল; বঙ্গভাষায় পুস্তক এবং পত্রিকা প্রচার করিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উপকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সুধাংশু' সংবাদপত্র এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল। এ পত্র দ্বারাও বঙ্গভাষার কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার পর (১৮৪১ কি ৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা দানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন—এ প্রবন্ধটিও জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

অকল্যাণ্ড এবং এলেনবরার পর হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কুটীল রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ভারতের সমূহ অনিষ্ট করিলেও, বঙ্গভাষার উন্নতি কামনায় তাঁহার সাহায্য, বঙ্গবাসীর চিরদিন স্মরণ থাকিবে। উৎসাহই উন্নতির মূল—মহত্ত্বের সোপান। মহাত্মা হার্ডিঞ্জ বঙ্গভাষার উন্নতি কামনায় নিযুক্ত কৃষ্ণমোহনকে সেই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে (১২৫২ সালে) "প্রথম শিখ-বিগ্রহ" অবসান হয়। ইহার পর বৎসরই (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" (Encyclopædia Bengaliansis) প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহা বঙ্গভাষার একটি প্রধান ভূষণ। মহাত্মা হার্ডিঞ্জের সাহায্যে কৃষ্ণমোহন

বঙ্গভাষাকে এই ভূষণ পবিধান করাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এ সময় কৃষ্ণমোহন অনেক ইংবাজী পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "কলিকাতা বিভিউ" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র এই সময় প্রচাবিত হইতে আবম্ভ হয়। কৃষ্ণমোহন এই পত্রেব এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি এই পত্রেব দ্বিতীয ভাগে "বাঙ্গালাব কুলীন ব্রাহ্মণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধটিব সাববত্তায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি। 'কলিকাতা রিভিউর' তাৎকালিক সম্পাদক এই প্রবন্ধটি পডিয়া মন্তব্যে লিখিযাছিলেন, "স্বদেশীয ভাষায লিখিবাও, কেহ ইহাপেক্ষা সুন্দব প্রবন্ধ লিখিতে পাবেন কিনা সন্দেহ।" ইংবাজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালী-যুবকের একপ সম্মান কি অল্প গৌববেব কথা?

ক্রমে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব দিন দিন সাধাবণে প্রচাবিত হইযা আসিল। দিন দিন তাঁহাব পদোন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্ট-পৌবহিত্যে ব্রতী থাকিবাব কালীন কৃষ্ণমোহনেব অনেক উচ্চপদ যুটিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান অনুবাদকেব পদে নিযুক্ত হইতে অনুবোধ কবিলেন, শিক্ষাসমিতি 'শিবপুব বিসপস্ কালেজেব' অধ্যাপকতা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিশেষরূপে বিদ্যাচর্চ্চাই কৃষ্ণমোহনেব জীবনেব বিশেষ লক্ষ্য। তিনি দেখিলেন, 'বিসপস্ কালেজেব' অধ্যাপকতা গ্রহণ কবিলে তাঁহাব সে লক্ষ্য সম্যক সাধিত হইতে পাবে। সুতবাং অন্য সকল কর্ম্মেব মায়া ত্যাগ কবিয়া, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে (১২৫৯ সালে) তিনি "বিসপস্ কালেজে" অধ্যাপকতা

গ্রহণ করিলেন। এই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডালহৌসীর শাসনে দ্বিতীয় ব্রহ্ম-বিগ্রহ সংঘটিত হয়।

কৃষ্ণমোহন প্রায় ষোড়শ বর্ষকাল বিসপ্স্ কলেজে অধ্যাপকতা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণমোহনের জীবনের অচিন্তনীয় সংঘটন,—জগতের নিকট তাঁহার উচ্চ সম্মান-লাভ। যে যুবক একদিন পরদ্বারে—পরাশ্রয়ে একমুষ্টি আহারীয় অন্নের ভিক্ষার্থী ছিল, বলিতে হৃদয় বিস্ময়ে চকিত ও আনন্দে উল্লাসিত হয়, যে, আজ সেই যুবককে জগজ্জীব সাদরে সম্ভাষণ করিয়া লইতেছেন, জগতে তিনি আজ অত্যুচ্চ সম্মাননায় সম্মানিত হইতেছেন। বঙ্গগৃহে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সহায়তায় ১৮৫১খৃষ্টাব্দে 'বেথুন সোসাইটি' সংস্থাপিত হয়, এসভা ইতি-পূর্ব্বেই কৃষ্ণমোহনকে ক্রমান্বয়ে সভ্য ও সহকারী সভাপতির পদে সম্মানিত করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) এ সময় আবার "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে স্ব স্ব সদস্যপদ প্রদান করিতে সম্মান বোধ করিলেন। তা'র পর ক্রমাগত (১৮৬৭ ও ৬৮ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন দুইবার "ফ্যাকল্‌টি অব্ আর্টের" সভাপতি হইলেন। এ পদে তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল সম্মানের সহিত কার্য্য করেন। কৃষ্ণমোহন প্রথমতঃ বিসপ্স্ কলেজের তৃতীয় অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেন। এ সকল ভিন্ন ও অগণ্য সভাসমিতি হইতে এ সময় কৃষ্ণমোহন উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ

করিয়া আপনার চেষ্টায় এরূপ সম্মান-লাভ কয় জন করিতে পারে?

বিসপস্ কলেজে কৃষ্ণমোহন এখন সংসারী। তিনি অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে সামাজিক-তাড়নে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন, আর বহুদিন পরে পরিবর্ত্তন চক্রের অনুকূল ঘূর্ণন তাঁহাকে এখন তদপেক্ষা বিস্তৃত সংসারের কর্ণধার করিয়াছে! সংসার-চক্রের গতিই এইরূপ! সহধর্ম্মিণী ও দাস দাসী ভিন্ন কৃষ্ণমোহনের এ সময় চারি কন্যা। ইতিপূর্ব্বে, হেদুয়ার গির্জায় খৃষ্ট-পৌরহিত্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার একটি পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছিল, কিন্তু অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। কন্যাচতুষ্টয়ের জ্যেষ্ঠার নাম কমলমণি ও মধ্যমার নাম দৈবকী। ইহাঁদের জন্মস্থানও হেদুয়ার ধর্ম্মালয়। অপর কন্যা-দ্বয়ের তৃতীয় কন্যার নাম মনমোহিনী ও চতুর্থ কন্যার নাম মিলি। ইহাঁরা এই বিসপস্ কলেজেই জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই কন্যাগুলি সমধিক লাবণ্যবতী। জ্যেষ্ঠা কমলমণির লাবণ্য জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর * তাঁহাকে বিবাহ করেন। অপর কন্যাত্রয়ের মধ্যমা দৈবকী সেল সাহেবের, তৃতীয় কন্যা মনমোহিনী প্রসিদ্ধ হুইলার সাহেবের এবং চতুর্থ কন্যা মিলি ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত পরিণীতা হন। কৃষ্ণমোহনের

---

* জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পুত্র। এরূপ বিবাহে বিধর্ম্ম গ্রহণে ইনি পৈতৃক বিষয় ভোগে বঞ্চিত হন। কিছুদিন হইল ইহাঁর পত্নী কমলমণির কাল হইয়াছে। অধুনা তাঁহার গর্ভজাত কন্যাদ্বয়েকটিকে লইয়া জ্ঞানেন্দ্রমোহন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন।

কন্যা কয়টিই সুশিক্ষিতা। তন্মধ্যে মনমোহিনী * শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা, স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা।

কৃষ্ণমোহনের শিক্ষানুরাগ অতুলনীয়। এ বয়সেও তাঁহার সে অনুরাগের অনুমাত্র হ্রাস পাইল না,—এ বার্দ্ধক্যেও তাহা যৌবনোচিত অটুট রহিল। বিভিন্ন প্রকৃতির অভিজ্ঞতা-লাভ-লালসা বহু দিন হইতে কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে দৃঢরূপে বদ্ধমূল ছিল। ইতিপূর্ব্বে, জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি বিভিন্ন জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি অবগত হইতেছিলেন, এখন বিসপ্‌স্‌ কলেজে আসিয়া তাঁহার সে চর্চ্চা আরও বৃদ্ধি পাইয়া আসিল। আশানুরূপ সংসঙ্গ পাইয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে নানা দেশের নানা ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

বিসপ্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কৃষ্ণমোহন দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় বিরত থাকেন নাই! এ সময়ে তাঁহার সাহিত্য-জগতের প্রধানতম কীর্ত্তি, ষড়দর্শন-প্রকাশ। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বিরল। কৃষ্ণমোহন এই ষড়দর্শন উভয় বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া উক্ত ভাষাদ্বয়ের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেন। ষড়দর্শন, কৃষ্ণমোহনের কেন, সমগ্র ভারতবাসীরই গৌরবের সামগ্রী। কৃষ্ণমোহন ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ষড়দর্শন প্রকাশ করেন। এই ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ক্যানিংএর পর এলগিন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

---

* ইনি অধুনা মিষ্ট্রেস্, এম, হুইলার (Mrs M Wheeler) নামে সাধারণে পরিচিত।

বিসপস্ কলেজে কৃষ্ণমোহন একটি ভয়ঙ্কর মনোবেদনা প্রাপ্ত হন। বিসপস্ কলেজ প্রাঙ্গনে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (১২৭৫ সালে) কৃষ্ণমোহনের প্রাণ-পত্নী বিন্দুবাসিনী মানবী লীলা সম্বরণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই বিয়োগক্লেশ বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী হইয়াছিল। এই মনোক্লেশ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণমোহন অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন। এ সময় ভারতবর্ষ লরেন্সের শাসনাধীন। এ শাসনে, এ সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার সর্ব্বনাশ হয়,—কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ভারতমাতাও অনেক বিয়োগক্লেশ ভোগ করেন

অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিয়াই কৃষ্ণমোহন কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর কৃষ্ণমোহন সপ্তদশবর্ষমাত্র জীবিত ছিলেন। এ সময় তাঁহার শরীর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, তাঁহার যৌবনোচিত দৈহিক বলবিক্রমের হ্রস্ব ভাব। কিন্তু দৈহিক বলবীর্য্যের হ্রস্বভাব হইলে কি হয়? এ সময় তাঁহার মানসিক চিন্তা-বীর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস নাই—বরং তাহা পূর্ব্বের অপেক্ষাও জ্যোতিষ্মান—প্রতিপদী শারদ-শশী যেন পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার প্রকৃতি-দত্তা সাহিত্য-বিষয়িণী শক্তি এ সময়ে পূর্ণশক্তি। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই তিনি সে শক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করিতে লাগি-লেন। ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের প্রধান ও প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। জাতি-চ্যুতি-পার্থক্য সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহন এই সময়ে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) সেই হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা টীকার সহিত প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইলেন। আর্য্যসাক্ষ্য নামে আর একখানি গ্রন্থও এই সময়ে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার

যশোভাতি সাহিত্য-জগতে বিস্তৃত করিল। এ গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের পর (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণমোহন আর্য্য-সাক্ষ্যের প্রতিপোষকতায় দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধ দুইটিও সাহিত্য-জগতে সাদরে গৃহীত হয়।

এ সকল ভিন্ন কৃষ্ণমোহন আরও বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শারীরিক মীমাংসার ভাষ্য, নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মপুত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ও ইংরাজী টীকার সহিত প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতের স্মরণীয় হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও অন্যান্য আকারেও কৃষ্ণমোহন বিস্তর পুস্তক প্রণয়ন করেন। এক জীবনে এরূপ বহুল সারবান পুস্তক প্রচার কীর্ত্তি-মহত্ত্বের পরিচায়ক। এরূপ কীর্ত্তিরক্ষণ চেষ্টাবান ব্যক্তিরই ভাগ্যাধীন। আর এরূপ কীর্ত্তি রাখিতেও যাঁহারা চেষ্টা পান, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য! কালে মহত্ত্ব তাঁহাদেরই অঙ্কশায়ী হয়।

সংসম্মান সৎকীর্ত্তির অনুসারী। কৃষ্ণমোহনের সৎকীর্ত্তিসমূহও এই নীতিক্রমে ক্রমে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম পদবীতে উন্নীত করিতে লাগিল। আণ্ডামানদ্বীপে দস্যুহস্তে মেওর অকালমৃত্যুর পর এই সময় নর্থব্রুক ভারত-শাসকপদে অধিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণমোহনের কীর্ত্তি-মহত্ত্ব স্বভাবের গুণে তৎপ্রতি তাঁহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণমোহন ইতিপূর্ব্বে 'সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ' প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করেন। এই সময় নর্থব্রুকের দৃষ্টি কৃষ্ণমোহনের সেই সাহিত্য পুষ্টিকারী কীর্ত্তির প্রতি পতিত হইল।

তিনি 'সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ' প্রচার জন্য কৃষ্ণমোহনকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইহার পর কৃষ্ণমোহনের নানা-বিষয়িণী বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বও তাঁহার গোচর হইল, তিনি কৃষ্ণমোহনের জ্ঞান-বীর্য্যে চমকিত হইলেন, স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনকে ডি, এল পদবীতে (Doctor in Law) গৌরবান্বিত করিলেন। এ সময়ে এরূপ গৌরব দুর্লভ। কৃষ্ণমোহনের এই দুর্লভ গৌরব-প্রাপ্তির অব্দে ভারত-সম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া-সুত "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, নর্থব্রুকের পর দুরন্ত লিটন ভারত-শাসন প্রাপ্ত হন।

এই সময় 'ইণ্ডিয়ান লিগ' নামে একটি দেশহিতকরী সমিতি সংগঠিত হয়। বঙ্গ-হিতকারী এই সমিতিতে অনেক মান্য গণ্য বাঙ্গালির সহানুভূতি ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন এই সভার সভাপতিপদে সম্মানিত হন। এ সভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৃষ্ণমোহন অনেকগুলি দেশ-হিতকর কার্য্যের সূচনা করেন, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান-মূলক শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভারতভূমি সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্যই পরমুখাপেক্ষী। সুখসৌকার্য্যের দ্রব্যই বল, বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জৈবনিকই বল, ভারতবাসী সকলের জন্যই ভিন্নদেশের নিকট কৃতলগ্নী-বাস। পরিধেয় বস্ত্র হইতে সামান্য সূচ সূতাটিরও জন্য ভারত-বর্ষ পরপ্রত্যাশী। 'ইণ্ডিয়ান লিগের' সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টি দেশের এই সকল অভাব দূরীকরণের প্রতি পতিত হইল। যাহাতে দেশের লোক শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত

হইতে পারে; যাহাতে দেশ হইতে বাষ্পীয়-যন্ত্রের নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন ও কাচের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ-ক্রিয়া সহজে নির্ব্বাহিত হয়, যাহাতে লৌহগঠন ও ধাতব গিল্টিকরণ প্রভৃতি কার্য্য দেশে অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে, কৃষ্ণমোহন এই সময়ে এইরূপ উদ্যম পাইতে লাগিলেন। ধনীর ধন সিন্দুক-জাত হইয়া বন্ধ্যাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, অথচ দেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়ন ও দারিদ্র্য-প্রকোপ বর্ত্তমান। যাহাতে বন্ধ্যাবস্থায় পতিত ধন অসংখ্য শুভফল প্রসব করিয়া দেশের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হয়, কৃষ্ণমোহন এ সময় সে জন্য স্বতঃই চেষ্টিত রহিলেন, শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, যথারীতি যন্ত্র-যন্ত্রালয় নির্ম্মাণের জন্য প্রয়াসী হইলেন।

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহনের এ প্রয়াস সম্যক ফলবতী হইতে পারে নাই। এ সময়ে এ সম্পর্কীয় আন্দোলনের জন্য দেশে দুইটি সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। সে সম্প্রদায় দুইটির,—একটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, ও অপরটি আমাদের কৃষ্ণমোহনের পরিচালিত ইণ্ডিয়ান লিগ। শিল্প-শিক্ষার প্রস্তাবনা এইরূপ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় দেশের সাহায্যদাতা ধনীগণের মধ্যেও দুই মত হয়। তন্মধ্যে কেহ বা 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার' ও কেহ বা 'ইণ্ডিয়ান লিগের' পক্ষ লয়েন। এইরূপ মতভেদে কার্য্যভেদ হওয়ায় কৃষ্ণমোহনের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইতে পারে নাই। অনেক বাক্‌ বিতণ্ডা ও আন্দোলনের পর, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার * কল্পনাই স্থায়ীত্ব

* ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (The

লাভ করে। ফলতঃ, এ সভাকেও দেশে শিল্প-বিদ্যা বিস্তারের জন্য কৃষ্ণমোহনের উদ্যমের একটি সুফল বলিতে হইবে। আর এ উদ্যমের জন্য কৃষ্ণমোহন যে যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণমোহনের এ উদ্দেশ্য সম্যক সফলতা লাভ না করার আর একটি কারণ, 'ইণ্ডিয়ান লিগের' অকালমৃত্যু। যাহা হউক 'ইণ্ডিয়ান লিগের' অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহন আর একটি সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইলেন,—এ সভার অকালমৃত্যুতে সুবিখ্যাত ভারতসভা কৃষ্ণমোহনকে সভাপতিপদ প্রদানে সম্মান বোধ করিলেন। ভারতসভায় আসিয়া কৃষ্ণমোহন প্রাণের মত সহকারীবৃন্দ প্রাপ্ত হইলেন, এতদিন পরে তাঁহার দেশহিতকরী প্রাণের আশা পূর্ণকাম হইবার পন্থা পাইল। তিনি এ সভায় প্রাণের ন্যায় সহকারীবৃন্দ পাইয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন, সতত সর্ব্বপ্রকারে জন্মভূমির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। জন্মভূমিও সৎপুত্র বলিয়া কৃষ্ণমোহনকে ক্রোড়ে লইলেন, হিন্দুসমাজ ভাই বলিয়া, প্রাণের বন্ধু ভাবিয়া, কৃষ্ণমোহনকে আলিঙ্গন দিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনক্রমে 'কলিকাতা মিউনিসিপালিটির' সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এ নির্ব্বাচনের সময়ও হিন্দু-সমাজ অপূর্ব্ব গুণ-মাহাত্ম্যে ভুলিয়া কৃষ্ণমোহনকে আপনাদের মুখপাত্র নিযুক্ত করিলেন,—আপন ভাবিয়া, সম্মান

Indian Association for the cultivation of Science) অধুনাপি বহুবাজার ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান আছে। এ সভা জীবিত থাকিয়া বিজ্ঞান চর্চায় দেশের অনেক হিতসাধন করিতেছে।

করিবা, মিউনিসিপালিটির সভ্যপদে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার স্বপক্ষে সম্মতি দিলেন। (যে হিন্দুসমাজ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগী করাইয়াছিল, সতত কঠিন-হৃদয় কাপালিকের ন্যায় তাঁহার নির্য্যাতনলগ্ন অপেক্ষা করিতেছিল, আজ সেই হৃদয়ের এই ভাব। ধন্য বীণাপাণি! তোমার অপূর্ব্ব মহিমা কে বুঝিতে পারে?

কৃষ্ণমোহনের দ্বারা বঙ্গদেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষা বিষয়েই বল, ধর্ম্ম নীতি বিষয়েই বল, সকল বিষয়েই বঙ্গবাসী কৃষ্ণমোহনের নিকট ঋণী। যে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার গৌরবে বঙ্গবাসী আজ গৌরবান্বিত, সে গৌরবেরও একটি মূল কৃষ্ণমোহন। এক সময়ে পঞ্জাবের ন্যায় বঙ্গদেশের উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী উপাধিদানের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা পরীক্ষায় উপাধি দানের কথা উঠিল। ভারত বিদ্বেষী ইংরাজগণও সে কথার পোষকতায় উত্তেজিত হইলেন,—সকলে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ রাখিয়া অভাগা বঙ্গবাসীগণের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন। এ সকল দেখিয়া, জন্মভূমির ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিয়া কৃষ্ণমোহনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি প্রাণপণে এ দুরভিসন্ধির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন, যুক্তি দেখাইয়া, অবিচার প্রতিপন্ন করিয়া এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতিবাদের ফল ফলিল, শিক্ষার প্রশস্ত পথ কণ্টকাকীর্ণ হইতে পাইল না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে, আর যাহার প্রচলনে আজ বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাভাষার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সে প্রথারও মূল কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের একান্ত যত্নেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা-প্রথা প্রথম সংস্থাপিত হয়। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকলেই কৃষ্ণমোহনের নিকট চিরঋণী—এ ঋণ আর কখনই পরিশোধ হইবার নহে।

সকল রাজনৈতিক আন্দোলনেই কৃষ্ণমোহনের যোগ ছিল; সকল আন্দোলনেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। লিটন-শাসনে মুদ্রাযন্ত্র-আইন স্থাপিত হইল, দেশীয় মুদ্রন-স্বাধীনতা একেবারেই লোপ পাইল। এ সময়ও ভারতসভার প্রতিনিধি-রূপে কৃষ্ণমোহন লিটনের এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; সতত কঠোর আন্দোলনে এ বিষম প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট থাকিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল আন্দোলনের ফলেই এ বিষম প্রথায় পরে সদাশয় রিপণের দৃষ্টি পতিত হয়, তাঁহার ন্যায় শাসন এ কঠোর শাসনের উচ্ছেদসাধন করে।

কৃষ্ণমোহনের হৃদয় সাম্য-স্বাধীনতার আধার। তাঁহার হৃদয়ে কখনও বৈষম্যের ছায়ামাত্র প্রবেশ করে নাই, কি বিপদে, কি সম্পদে, কখনই তিনি হৃদস্থিত স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দেন নাই। কৌমারে তিনি স্নেহময়ী জননী, প্রাণ-প্রিয় ভাই ভগ্নী ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি সমাজের বিষম বৈষম্য সহ্য করিতে পারেন নাই; আহারীয় অন্নের—পরিধেয় বস্ত্রের—আবাস গৃহের প্রচুরতম কষ্ট অবনত

মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আপনার আবাধ্যা স্বাধীনতার পূজায় অমনোযোগী হন নাই। কৌমার হইতে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ের সাম্য-স্বাধীনতা সমুজ্জ্বল ও সমদীপ্ত ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 'সেণ্টপল ক্যাথিড্রাল' নামে একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন এই ধর্ম্মমন্দিরে একটি সম্মানসূচক পদবী প্রাপ্ত হন, তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ কৃষ্ণমোহনকে তাঁহার প্রথম ক্যানন নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াই আপনার ধর্ম্ম-বৈষম্যের পরিচয় দিলেন, একজন ইউরোপীয়কে ক্যাননপদে বরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "কৃষ্ণমোহন বাঙ্গালী, সুতরাং তিনি বাঙ্গালী-খৃষ্টানের ক্যানন থাকিবেন, আর ইংরাজ ইংরাজ-সম্প্রদায়ের ক্যানন হইবেন।" ধর্ম্মরাজ্যেও শ্বেত-কৃষ্ণ বৈষম্য। সাম্যবাদী কৃষ্ণমোহনের এ বৈষম্য সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বেই সসম্মানে ক্যানন-পদ পরিত্যাগ করিলেন।

ক্যানন-পদ পরিত্যাগের পর ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ কৃষ্ণমোহনকে অনেক বুঝাইলেন, বিনয়সহকারে উচ্চপদ পুনঃগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সকলই বিফল। সামান্য সামাজিক বৈষম্যের জন্য যিনি আত্মজন ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, ধর্ম্ম-জগতে এরূপ শ্বেত-কৃষ্ণ-বৈষম্য থাকিতে কেমন করিয়া তাহাতে তিনি সংলিপ্ত থাকিবেন? সুতরাং কৃষ্ণমোহন আর এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, কোনক্রমেই স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ভাতি তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপকে স্পষ্টতঃই বলিলেন, "আমি

কখনই ওপদ পুনর্গ্রহণ করিতে পারিব না। চিরসাম্য ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ বৈষম্যভাব দর্শন করিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়।”

একাধারে সাম্য-স্বাধীনতার আরও প্রচুরতম দৃষ্টান্ত কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে বর্ত্তমান। এক সময়ে কৃষ্ণমোহন কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের অবৈতনিক মাননীয় চ্যাপলেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম্মালয়ের নিয়ম, রবিবারে—ভজনার দিন সম্মানোচিত বেশ-বিন্যাসে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ অগ্রে ভজনালয়ে প্রবেশ করিবেন, ও তৎপরে নির্দ্দিষ্ট পদসূচক পরিচ্ছদে চ্যাপলেনগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ পদপার্থক্য সাম্যবাদী কৃষ্ণমোহনের বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল তিনি আর এরূপ লৌকিক আচারে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি প্রকৃত হৃদয়বান ধার্ম্মিকের ন্যায় লোক-কোলাহলের অন্তরে—ধর্ম্মালয়ের একপার্শ্বে, সরল বেশে, পবিত্র মনে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার এরূপ ভাব ধর্ম্মযাজক বিশপের গোচর হইল। একদা বিশপ কৃষ্ণমোহনকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মালয়ের নিয়মানুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বৈষম্য-বিরোধী স্বাধীন-হৃদয় এরূপ অধীন নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবে কি প্রকারে? সুতরাং কৃষ্ণমোহন সসম্মানে ধর্ম্মযাজক বিশপের কথার উত্তর দিলেন; বলিলেন, “রাজাপারিষদের মানাপমান কি ধর্ম্ম জগতেও বর্ত্তমান? এখানেও কি পার্থিব জাঁকজমক ও মান সম্ভ্রমের সমাদর করিতে হইবে?” যদি তাহা হয়, আমি কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ অপারক।

কৃষ্ণমোহনের স্বাধীন হৃদয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত,—বৃদ্ধবয়সে যৌবনোচিত তেজস্বিতায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য-পদ ত্যাগ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের বিপক্ষে একটি অভিযোগবার্ত্তা প্রচারিত হয়; কমিশনারগণ স্ব স্ব বিভাগীয় স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখায় কলিকাতায় স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথা বঙ্গেশ্বর টম্সনের কর্ণে স্থান পায়। বঙ্গেশ্বর বিশেষরূপে সে অভিযোগের সত্যাসত্য কারণ নির্দ্ধারণ না করিয়া, কনিংহামপ্রমুখ স্বাস্থ্য-সমিতির অধ্যক্ষগণের প্ররোচনায় একেবারেই মিউনিসিপ্যালি-টির কমিশনারগণের উপর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। সে নিয়োগ কিন্তু কৃষ্ণমোহনপ্রমুখ স্বাধীনচেতা কমিশনারগণের সহ্য হইল না; সম্যক্‌রূপে অভিযোগের উত্তর না লইয়া তাঁহা-দিগকে অন্যের কর্ত্তৃত্বের অধীন করাতে তাঁহারা স্বাধীনভাবে মানে-মানে স্ব স্ব সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। এ পদ ত্যাগের পরই বঙ্গেশ্বর পুনর্নির্ব্বাচনে ঐ সকল পদে নূতন কমিশনার নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সকলই বিফল! সাধারণ করদাতাগণের নির্ব্বাচনে ছোটলাটের আশা মিটিল না; স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অভিযোগের কোন বিশেষ ভিত্তি না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় পদচ্যুত ব্যক্তিগণকেই সসম্মানে পুনর্নির্ব্বাচিত করিলেন; স্বাস্থ্য-পরিদর্শক স্থায়ী হইল না। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন এইরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন; এইরূপে আপনার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া-ছেন। পতিত বাঙ্গালী-জীবনে ইহা কি গৌরবের কথা নহে?

কৃষ্ণমোহনের আত্মীয়-প্রীতি অচলা,—মাতৃভক্তি প্রশংসনীয়া। সামাজিক-তাড়নে স্বজন-ত্যাগী হইয়াও কৃষ্ণমোহন একদিনের জন্য আপনার স্নেহময়ী অভাগিনী জননীকে বা প্রাণপ্রিয় সহোদর-সহোদরাগণকে ভুলিতে পারেন নাই। বিধর্ম্মী হইলেও, হিন্দুসমাজের কুটিল দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত থাকিলেও, কৃষ্ণমোহন সতত আপনাকে জননীর সেবায় ব্যাপৃত রাখিয়া ছিলেন; হিন্দু-সমাজের অলক্ষ্যে তিনি পূজনীয়া জননীর চরণ অর্চ্চনা করিতেন,—সতত অর্থসাহায্যে ও লোকসাহায্যে তাঁহার সেবা করাইতেন। তাঁহার পৈতৃক সংসারে নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়ন; কিন্তু কৃষ্ণমোহনের গুপ্ত-সাহায্য তাহার প্রভাব সম্যক পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল। ক্রমে সে সাহায্যে সে পতিত সংসার পার্থিব সুখের আগার হইয়া আসিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত,—বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত এরূপ ভাষা অতি অল্প আছে, কৃষ্ণমোহন যাহা অধ্যয়ন করেন নাই। ভারতবর্ষের প্রচলিত কি সংস্কৃত, কি আরবি, কি উর্দ্দু, কি পার্শী কৃষ্ণমোহন সকল ভাষাতেই সুপণ্ডিত; লাটিন, গ্রিক, ইংরাজী, হিব্রু, বাঙ্গালা ও উড়িয়া এ সকলই কৃষ্ণমোহনের বিশেষ আয়ত্ত। সমগ্র জীবনে মানবসমাজ একটি ভাষাও সম্যকরূপে শিক্ষা করিতে পারেন না; কিন্তু কৃষ্ণমোহন আপনার ঐকান্তিক যত্নের গুণে (একটি দুইটি ত তুচ্ছ কথা!) একাদশটি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে, বহু ভাষা শিক্ষায় বহু অন্তরায় সত্ত্বে আপনার অধ্যবসায় ও উদ্যমে, যিনি এত ভাষায় সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তিনি কি জীব-জগতে মহত্তের

দৃষ্টান্ত নহেন? তাঁহার অনুসরণে জীব-জগৎ কি পতিত অবস্থার উন্নত করণের প্রশস্ত পন্থা চিনিয়া লইবেন না?

কৃষ্ণমোহন উপকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। কখনও কাহারও নিকট সামান্য উপকার পাইলে তিনি তাহা কোনক্রমে বিস্মৃত হইতেন না। ভারতশাসক হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন; পতিত বাঙ্গালীর শিক্ষাকল্পে উৎসাহ দেন। হার্ডিঞ্জের এ উপকার কৃষ্ণমোহন সতত স্মরণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ইংলণ্ড-গমন সময় কৃষ্ণমোহনপ্রমুখ দেশের মুখপাত্রগণ একটি সভার আহ্বান করেন। সে সভা অধিবেশনের উদ্দেশ্য, বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা-উপহার জন্য হার্ডিঞ্জকে কৃতজ্ঞতা-প্রত্যুপহার প্রদান। বঙ্গবিদ্বেষী ইংরাজগণের কিন্তু ইহা সহ্য হইল না। বঙ্গের শিক্ষাসখা হার্ডিঞ্জকে এরূপ প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী ভারত-শাসকগণ সে আশায় আবার বঙ্গবাসীর উপকার করিতে পারেন, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় কলিকাতার ইংরাজ ব্যারিষ্টারগণ এ সভায় প্রতিবাদী হইলেন; গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইয়া ও মতবিরোধ দেখাইয়া যাহাতে এ সভায় শিক্ষা-সহায়তার জন্য হার্ডিঞ্জকে ধন্যবাদ না দেওয়া হয়, তজ্জন্য ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের তেজস্বিনী বক্তৃতায় সে আন্দোলনে কাহারও মন টলিল না। বঙ্গের মুখপাত্রগণ এক প্রাণ হইয়া কৃষ্ণমোহনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন,—সে সভায় হার্ডিঞ্জকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

হেয়ার সাহেব শিক্ষাসম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার করিয়া

ছেন ; সেজন্য ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট চিরঋণী। যখন বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজ-দৃষ্টি পতিত হয় নাই, ভারতের শিক্ষা-সখা খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের ভারতবাসীগণকে শিক্ষাদান-কল্পনা মুকুলিত হইবার বহুপূর্ব্বে, মহাত্মা ডেভিড হেয়ারই ভারতবর্ষে ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তিনিই সে ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারের একমাত্র পথপ্রদর্শক। কৃষ্ণমোহনের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাল্য-জীবনও ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় সে অন্ধকার হইতে আলোকে নীত হইয়াছিল,—তিনিই সে জীবন ক্রমসংগঠনের প্রধান সহায় ছিলেন। এ অন্ধকারের পথপ্রদর্শক, ভগ্নপ্রায় জীবনের সংগঠক মহাত্মাকে (কৃতজ্ঞহৃদয় কৃষ্ণমোহন তো অন্য কথা!) কোন্ পাষণ্ডহৃদয় বিস্মৃত হইতে পারে? কৃষ্ণমোহন তাঁহার ও স্বদেশের এ উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত থাকেন নাই। যেখানে ডেভিড হেয়ারের নাম হইত, যেখানে তাঁহার স্মরণ-সভার অধিবেশন হইত, অনুগত কৃতজ্ঞ ভৃত্যের ন্যায়—আরাধ্য দেবের আরাধনার প্রায় কৃষ্ণমোহন সততই সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। আর যাহাতে ভাবী বঙ্গসমাজও ডেভিড হেয়ারের নামে কৃতজ্ঞ থাকেন, এ চেষ্টাও কৃষ্ণমোহনের সম্পূর্ণ ছিল। তিনি সৎবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্পষ্টতঃই বলিতেন, "ভারতবাসীর হৃদয়ে যতদিন কৃতজ্ঞতার ছায়ামাত্র বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মহাত্মা-ডেভিড হেয়ারের নাম তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে।"

কৃষ্ণমোহন দয়ার অবতারমূর্ত্তি ছিলেন; দীনে দান তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। তিনি অন্নাভাবে দরিদ্রের ক্রন্দন বা বস্ত্রাভাবে দীনের উলঙ্গ অঙ্গ দর্শন করিতে পারিতেন না। সে

দর্শনে তাঁহাব প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিত—হৃদয় বিষম শেলে শতধা বিদীর্ণ হইত। নাম পাইবার আশায় ধনবানের দান বৃহদ্ব্যাপারে; অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইবে কিম্বা নব-ইয়র্কে প্রদর্শনী খুলিবে, নাম-প্রয়াসী ধনবান তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রচুর অর্থ দান করিতে পাবেন; কিন্তু সম্মুখে পিপাসায় শুষ্কতালু কিম্বা অনাহাবে অসন্ন-মৃত্যু দেখিলেও তাঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কৃষ্ণমোহনেব প্রকৃতি কিন্তু এরূপ ছিল না। তিনি একপ যশঃপ্রত্যাশাব পবিবর্ত্তে ধর্ম্মপ্রত্যাশা ছিলেন। দীনের সাহায্যই তাঁহাব ধর্ম্মেব একটি অঙ্গ ছিল; তাহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান কবিয়াই তিনি চবিতার্থতা লাভ কবিতেন।

প্রকৃত দীন-দয়ালেব হৃদয সাধাবণ মনুষ্য-হৃদয় হইতে ভিন্ন। যশঃপ্রয়াসী সাধাবণ মনুষ্য-দাতাব দান আড়ম্বরময়, আর প্রকৃত দবিদ্র-দুঃখ-ব্যথিত দাতার দান আড়ম্ববশূন্য। সাধারণ মনু-ষ্যেব দানকার্য্যেব ন্যায় কৃষ্ণমোহনের দান লোকে সচবাচর প্রকাশ পাইত না; তিনি তাঁহাব দান-কার্য্যেব কথা স্বতঃই জগ-তেব অগোচরে বাখিতেন। তাঁহাব দানকার্য্য এরূপ নীরবে নিষ্পন্ন হইত যে, বলিতে কি, সময়ে সময়ে দানপ্রার্থীও তাঁহাকে দানকর্ত্তা বলিয়া চিনিতে পাবিত না। হিন্দুগণ সাধারণতঃ অন্য জাতির নিকট দান গ্রহণ করিতে বড়ই অপমান বোধ কবেন; এমন কি, একপও দেখা গিয়াছে, কোন কোন হিন্দু দারিদ্র্য-পীড়নে জীবনে জলাঞ্জলী-দানও শ্রেয়জ্ঞান কবিয়াছেন, তথাপি কোন বিধর্ম্মীর নিকট প্রাণান্তেও দান গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণমোহনের অনেক হিন্দু আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশীয়গণ দারিদ্র্য-পীড়িত ও অন্নবস্ত্রেব অভাব-ক্লেশে আসন্নক্লিষ্ট ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন আপনার দানকার্য্যের স্বাভাবিক আড়ম্বরশূন্যতা হেতু বা বিধর্ম্মী বলিয়া হিন্দু-আত্মীয়গণ তাঁহার দান লইতে অপমান বোধ করিতে পারেন ভাবিয়া, এই সকল আত্মীয়স্বজনের জন্য নিভৃত দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-মোহন এরূপ ছদ্মবেশে সাহায্য করিতেন যে, বলিতে কি, সময়ে সময়ে "দানকর্ত্তা যে কৃষ্ণমোহন" ইহা তাঁহাদের অনুভবেই আসিত না। শুনিয়াছি, ইংলণ্ডের এইরূপ একজন দানকর্ত্তা তত্রত্য প্রসিদ্ধ কবি কাউপারের দরিদ্রাবস্থার সময় তাঁহাকে এইরূপ ছদ্মবেশে দান করিতেন। বোধ হয়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর দাতাদের হৃদয় স্বতঃই এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে আর একটি মহত্ত্ব যে, তিনি প্রতি-দান আশা করিতেন না। জগতে এরূপ দাতা অতি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে দানের প্রতিদান আশা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের হৃদয় ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। একসময়ে একব্যক্তি দায়গ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণমোহনের নিকট কতকগুলি অর্থ প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণমোহনও ঐ ব্যক্তিকে প্রকৃত বিপদাপন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার যাচিত অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাঁহার বিপদ-দায় নিবারণ করেন। পরে কিছুকাল গত হইলে, ঐ ব্যক্তি সুসময় পাইয়া একদিন কৃষ্ণমোহনকে তাঁহার দেয় অর্থ প্রত্যার্পণ করিতে আসেন। কৃষ্ণমোহন যখন ঐ ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন, তখন তাঁহার নিকট কোন প্রত্যার্পণ আশা করেন নাই; দরিদ্রের বিপদে কেবলমাত্র সহানুভূতি দেখাইয়াই তিনি তাঁহাকে ঐ অর্থ দান করিয়াছিলেন। আরও

তিনি ঋণদাতার ন্যায় বহুদিন ধরিয়া এ অর্থদান মনে করিয়াও রাখেন নাই। সুতরাং ঐ ব্যক্তি দেয় অর্থ প্রত্যার্পণ করিতে আসিলে তিনি বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "কিসের টাকা? কই আমি তো আপনাকে কখন টাকা ধার দিই নাই!" কৃষ্ণমোহনের এ উত্তর শুনিয়া ঋণকারী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট ঋণগ্রহণের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। সে সকল বিবরণ শুনিয়া কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "আপনাকে ঋণদানের কথা আমার তো স্মরণ হয় না। যদি আপনাকে কখনও টাকা দিয়া থাকি, তাহা আমি ঋণহিসাবে দিই নাই; আপনার বিপদ দেখিয়া বোধ হয়, আপনাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। তা' যা'ই হউক, আমি আর ও টাকা চাহিনা, আপনি ও টাকার যথেচ্ছ সদ্ব্যয় করিতে পারেন।" সাধুর হৃদয়ই এইরূপ! প্রেমদান করিয়া একদিন বিস্ময়বিভোরে চৈতন্যদেবও তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রেম প্রত্যার্পণ-আশা করি না। তোমরা তাহার কেবল সদ্ব্যবহার কর।"

পাপকার্য্য ও কুচরিত্রের প্রতি কৃষ্ণমোহনের বড়ই ঘৃণা ছিল। তাঁহার জীবনে তিনি কখনই কোন পাপকার্য্যের ও কুচরিত্রের উৎসাহ দেন নাই। তিনি কুসংসর্গ বড়ই দোষের জিনিস মনে করিতেন। সে সংসর্গে যোগদান বা অবস্থিতি করা তো ভিন্ন কথা, তিনি কুচরিত্রের ছায়া স্পর্শ করিতেও আপনাকে অবমানিত বোধ করিতেন। অধিক কি, কুচরিত্র ব্যক্তি উচ্চপদস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। কলিকাতার "টাউন-হল-গৃহে" একদিন একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইলে;

সে সভায় অনেক মান্য গণ্য লোকের সম্মীলন হয়। কৃষ্ণমোহনও সে সম্মীলনে উপস্থিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে একজন উচ্চপদবীস্থ বাঙ্গালী উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাব সম্বর্দ্ধনার্থ করপ্রসারণ (Shake-hand) কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে সম্ভাষণ কবিবাব জন্য কবপ্রসাবণ কবিলেন না; ঐ উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিব চরিত্র-দোষ থাকায় তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবিতে আপনাকে অবমানিত বোধ কবিলেন। যাঁহাব ভ্রূভঙ্গিতে বাঙ্গালা কম্পিত হয়, এক চবিত্রদোষেব জন্য কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে অপদস্থ কবিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রকৃত হৃদয়বান ধার্ম্মিকেব সৎসাহসই এইরূপ!

কৃষ্ণমোহনেব ন্যায় স্বাবলম্বনপ্রিয ব্যক্তি অতি বিবল। বালকবয়স হইতেই তিনি যে আত্ম-নির্ভবতা অবলম্বন কবিয়া ছিলেন, অতি প্রাচীন বযস পর্য্যন্তও তাঁহাতে সে ভাব বর্ত্তমান ছিল। তিনি একদিনেব জন্যও কোন বিষযে কাহাবও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। "আমি উপার্জ্জন কবিব, দশজন আমাব অন্নে প্রতিপালিত হইবে," তাঁহাব হৃদযে সতত এই ভাব বর্ত্তমান ছিল। হৃদয় এইরূপ স্বাবলম্বনপ্রিয় থাকাতেই তিনি সামাজিক-তাড়নে অম্লান বদনে পিতৃ-ভবন ত্যাগ কবিয়াছিলেন; "আমি পুরুষ, আত্মনির্ভর না কবিলে আমাব চলিবে কেন?" এই ভাবিয়া সে সময় তিনি মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তা'ব পব কুটিল সমাজ-চক্রে যখন তিনি হেয়ারস্কুলের শিক্ষকপদে বঞ্চিত হইলেন, তখনও তাঁহাব মনে এই ভাব! তখনও তিনি ভাবিয়াছিলেন, "কর্ম্ম যাউক, কোন ক্ষতি নাই। দুই দিন পরে আবার কর্ম্ম যুটিবে; উন্নতির চেষ্টা থাকিলে কখনই অবনতি হইবে না।"

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে যাইলে কৃষ্ণমোহনের জীবনের সকল অবস্থাতেই তাঁহার স্বাবলম্বনপ্রিয়তার প্রচুরতম দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। সাধারণ করদাতাগণ সম্মতি না দিলে কাহারও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যপদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই উক্ত পদপ্রয়াসীরা সাধারণতঃ বিভাগীয় করদাতৃগণের মুখাপেক্ষী হয়; প্রত্যেকের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদের নিকট আপনার সভ্যপদপ্রাপ্তির সম্মতি প্রার্থনা করে। কৃষ্ণমোহন কিন্তু সাধারণের এরূপ তোষামোদ করিতে পারিতেন না; "ইচ্ছা হয়, সাধারণে আমায় সভ্য নির্ব্বাচন করিবে, না হয় না করিবে," এই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অতি অল্প লোকেই এইরূপ আত্মনির্ভর হইতে পারে।

কৃষ্ণমোহন একজন প্রকৃত সত্যানুসন্ধায়ী ছিলেন। কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সাহিত্যবিষয়ে, কি আচার ব্যবহারে কৃষ্ণমোহন সকলেরই মূল সত্য অনুসন্ধান করিয়া, পরে তাহা অবলম্বন করিতেন। অবলম্ব্য পথ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাৎপর্য্যময় কি তাৎপর্য্যশূন্য, এসকল পুঙ্খানুরূপে না দেখিয়া তিনি কখন তাহাতে সংলিপ্ত হইতেন না। কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ের এই মহৎ ভাব তাঁহার যুব-সুহৃৎ ডিরোজিওর উপদেশ হইতে প্রধানতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কথিত আছে, পাঠ্যাবস্থায় কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে ডিরোজিওর সহিত কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিলে তিনি স্বতঃই তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন; সকল সুযোগেই ডিরোজিও কেবল ইহাঁদিগকে শিক্ষা দিতেন, "যাহা কিছু তোমাদিগের হৃদয়ে সত্যরূপে উদিত হইবে, সত্যের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া, স্বতঃই তোমরা

তাহার অনুসরণে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিবে।” জীবনে কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর এ উপদেশ কখনই বিস্মৃত হন নাই। যে বিষয়েই বল, যখন যাহাতে সত্য দেখিতে পাইতেন, তিনি তখনই তাহাব আদর করিতেন। আব হৃদয়ে এই ভাব বর্ত্তমান থাকাতেই, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও সময়ে সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্যভাব ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং আপনার ত্যজ্য হিন্দুধর্ম্ম হইতেও সারভাগ গ্রহণ করিতে বিরত থাকিতেন না। ফলতঃ সত্যানুসন্ধান তাঁহার জীবনের একটি ব্রত ছিল। মহৎ ব্যক্তিমাত্রেই এই ব্রতের উপাসক। এই সত্যানুসন্ধানের জন্যই সাধক বুদ্ধ রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন; অতুল রাজধনে তৃপ্তি না পাইয়া বনে দাতা তরুলতার নিকট ভিক্ষা মাগিয়াছিলেন।

সদনুষ্ঠানমাত্রেই কৃষ্ণমোহনের উৎসাহ ছিল। কি বৃদ্ধ, কি বালক কৃষ্ণমোহন সকলের সকল সদনুষ্ঠানেই যোগ দিতেন। বাল-যুবারা কোন সৎকার্য্যেব আয়োজন করিলে সাধরণতঃ লোকের নিকট তাহারা কোন সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় না; মদ্য-পান-নিবারণী সভা বা শিক্ষা-সমিতি সংগঠন প্রভৃতিতে যুবকগণ যোগ দান করিলে দেশের কতকগুলি লোকে প্রায়ই তাহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে। কৃষ্ণমোহন কিন্তু তাহা করিতেন না। যেরূপে হউক, যুবকগণ সৎপথাবলম্বী হইয়া অসৎ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করে, তিনি সর্ব্বদা সেইরূপ কার্য্যেই তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাহাদিগের সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া বা তাহাদের সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া তিনি যুবকদিগকে সন্নীতি শিক্ষায় ও পাপপুণ্যের ফলাফল-জ্ঞান দান করিতেন। পতিত

নারীজাতির সংশিক্ষার জন্যও কৃষ্ণমোহন অনেক চেষ্টা পাইতেন; পুস্তকপ্রণয়ণ করিয়া বা দেশে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের সহায় হইয়া তিনি প্রায়ই তাহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে উৎসাহ দিতেন। সংক্ষেপতঃ কৃষ্ণমোহন আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকলেরই সদুপদেষ্টা। বস্তুতঃ কৃষ্ণমোহনের সর্ব্বোপদেশক ভাবে ধর্ম্মজগতের চৈতন্য ও বুদ্ধ, ঈশা এবং মহম্মদকে স্মরণ হয়; কারণ তাঁহারাই জগতে এই সৎসহানুভূতির প্রথম দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণমোহনের পরোপকারব্রত মহান্ উদারতায় পূর্ণ। জগতে উপকারীর উপকার সকলে করিয়া থাকে, কিন্তু অপকারীর উপকার কয়জন করিতে পারে? বল দেখি, উদার পাঠক পাঠিকে! শত্রুর উপকারের কথা দূরে থাক্, তোমরা কি কখন অপকারীর অপকার করিতে বিরত থাকিয়াছ? কিন্তু কৃষ্ণমোহনের জীবন (অপকার তো অন্য কথা!) চিরশত্রুর স্বতঃই উপকার করিয়াছে। প্রথম দেখ, তাৎকালিক হিন্দুসমাজের প্রতি! হিন্দুসমাজ কৃষ্ণমোহনের কি অপকার না করিয়াছেন? হিন্দুসমাজ হইতেই তাঁহার স্বজনচ্যুতি! হিন্দুসমাজ হইতেই তাঁহার অহাবীয় অন্নে ধূলিনিক্ষেপ! আবার হিন্দুসমাজ হইতেই তাঁহার সংহনন-চেষ্টা! এত অত্যাচার—এত পীড়ন—এত শত্রুতা ভুলিয়াও রক্তমাংসগঠিত কোন্ মনুষ্য-হৃদয় শত্রুর উপকার করিতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণমোহন আপনার এই চিরশত্রু হিন্দুসমাজের উপকারের জন্য কি না করিয়াছেন? শিক্ষা বল, নীতি বল, আর্থিক সাহায্য বল, বা উচ্চ পদ-গৌরব বল, এ সকলের জন্যই কৃষ্ণমোহন হিন্দুসমাজের উপকারী। তার পর দেখ, কৃষ্ণমোহনের আত্মীয়স্বজনের প্রতি! অসময়ে আত্মীয়-

স্বজন কৃষ্ণমোহনের কি নির্য্যাতনই না করিয়াছেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভুবনমোহন তাঁহাকে বাড়ী হইতে সন্তাড়িত করিয়াছেন; সহধর্ম্মিণী পত্নীর জন্য তাঁহাকে বিচারালয়ের সাহায্য লইতে হইয়াছে। কিন্তু কই কৃষ্ণমোহন তো ইহাঁদের উপকার করিতে এক দিনের জন্যও বিরত থাকেন নাই। তিনি স্বভবন হইতে বহিষ্কৃত থাকিয়াও, জ্যেষ্ঠ ভুবনমোহনের অন্নক্লিষ্ট সংসারে বিস্তর সাহায্যদান করিয়াছেন, ভ্রাতৃদুহিতা ও দৌহিত্রগণকে আপন ভাবিয়া তাহাদের লালনপালনের সহায় হইয়াছেন। আরও বিদ্বেষী শ্বশুরকেও কখন সাদর সম্ভাষণ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এরূপ শত্রুপ্রীতি মহতেই করিতে পারেন; মহান্-হৃদয় ধর্ম্মাত্মা-গণই ইহার সং-দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মাত্মা চৈতন্য তাঁহার চিরবিদ্বেষী জগাই-মাধাইএর প্রতি এই রূপ প্রীতি দেখাইয়াছিলেন; শত্রুভাবে তাহারা তাঁহার অপকার করিতে যাইলে, তিনি তাহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন; পাষণ্ড নাস্তিকগণকে মুক্তির উপায় হরিপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ শত্রু-প্রীতি আরও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মাত্মা ঈশার হৃদয়ে; অধার্ম্মিক রাজা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া সংহার করিতেছে, তথাপি তিনি তখনও উপকারী বন্ধুর ন্যায় তাহাকে বলিতেছেন, "রাজন! ঈশ্বরে ভক্তি করিতে ভুলিবেন না;—ঈশ্বরের নামই মুক্তির একমাত্র উপায়।"

কৃষ্ণমোহন মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন। পরিমিতব্যয়ী হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় রাখা মনুষ্য-জীবনে যে অতি প্রয়োজন, কৃষ্ণমোহন তাহা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। সঞ্চিত ধন অসময়ের বন্ধু। কিছু কিছু সঞ্চয় করিলে লোকের দুঃসময় হটাৎ আসিতে

পারে না,—তাহার সঞ্চিত বস্তু যেন দুঃসময়ের পথে কণ্টক হয়। দানাদিতে কৃষ্ণমোহনের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত বটে, কিন্তু তথাপি তিনি অসময় ভাবিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে বিরত থাকিতেন না। পরিমিত ব্যয়ের পর এইরূপ কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণমোহন অন্যূন ষষ্টি সহস্র টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' এবং কলিকাতা ও হাবড়ায় অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী ক্রয় করেন। এই সকল বাটীর ভাড়া ও কোম্পানির কাগজের সুদ পরে কৃষ্ণমোহনের একটি আয় হইয়াছিল। পরিমিত-ব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই এইরূপ আয়ে বড়মানুষ হইয়া থাকেন। পরিমিত ব্যয় ও সঞ্চয়ের গুণে কাঙ্গালী কালে ক্রোড়-পতি হইতে পারে, অন্নের ভিখারী অন্যে অন্ন-দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

জগতে মহজ্জীবনের একটি প্রধান অবলম্বন,—পরিশ্রম। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে জীব-জগতে মহৎ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই সেই মহত্ত্বের মূলসূত্র পরিশ্রম। শ্রমশীল না হইলে—অবহেলায় সময় কাটাইলে কখনই কেহ আপনার পতিত অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না; শ্রমবিমুখ, আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বতঃই জগতে নীচত্বের দৃষ্টান্ত। যিনি সময়ের সুব্যবহার করিতে পারেন, এ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব-লাভ তাঁহারই ভাগ্যাধীন। কৃষ্ণমোহন সেই শ্রমপরায়ণের অগ্রণী,—শ্রমশীলতাই তাঁহার যেন জৈবনিক ছিল। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে কৃষ্ণমোহন একদিনের জন্যও আপনাকে শ্রমবিরত রাখেন নাই। কৃষ্ণমোহন, শৈশবে যখন সংসারতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ছিলেন, তখন তাঁহাকে কতই সংসারের কায করিতে হইত; রন্ধন-গৃহ-পরি-

করণ, মাতুলালয়ে নারায়ণ-অর্চ্চন, আহারীয় অন্নের রন্ধন, সে সময়ে তাঁহার নিত্য-ক্রিয়া ছিল। সে সকল নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন কৃষ্ণমোহনের সে সময় পাঠ্যাবস্থা;—সাংসারিক কার্য্যে দিবাভাগে পাঠাভ্যাসের বিশেষ সময় পাইতেন না বলিয়া তাঁহাকে রাত্রি-জাগরণশ্রমে নিত্যপাঠ প্রস্তুত করিতে হইত। জানি না, এরূপ বালকবয়সে আপনার কঠিন কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিয়া জগতে কোনও ব্যক্তি এত পরিশ্রম করিতে পারিয়াছেন কি না।

কৃষ্ণমোহনের যৌবন ও বার্দ্ধক্যকালীন পরিশ্রমও অতুলনীয়। তাঁহার এ সময়ের শ্রমশীলতা দেখিলে তাঁহাকে জগতের লোক হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। জগতের লোকের যৌবন সাধারণতঃ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়,—ভোগবিলাসিকতায় মিশিয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে জগতের লোক প্রায়শঃই শ্রমবিমুখ ও পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের জীবনে এ যৌবন-বার্দ্ধক্যের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিলক্ষিত হইত। পরিশ্রমই তাঁহার এ সময়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কি প্রাতঃকাল, কি মধ্যাহ্নকাল, কি সন্ধ্যা, কি গভীরা রজনী সকল, সময়েই কৃষ্ণমোহন কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। যখন দেখিবে, তখনই দেখিবে, হয় কৃষ্ণমোহন ঈশ্বর-ধ্যানে মগ্ন, নয় দেশের হিতসাধনে ব্রতী। যখন শুনিবে, তখনই শুনিবে, হয় কৃষ্ণমোহন জ্ঞান-বিতরক লেখক, নয় জ্ঞানান্বেষী পাঠক। যখন জানিবে, তখনই জানিবে, হয় কৃষ্ণমোহন সর্ব্বহিতকারী সভা সমিতিতে, নয় আত্ম-রক্ষক সংসার পরিদর্শনে। ফলতঃ কার্য্যই তাঁহার জীবনস্বরূপ ছিল; কার্য্য বই তিনি আর কিছুই জানিতেন না। মহতের কার্য্যই অবলম্বন; মহতেরা কেবল

কার্য্যেই জানিয়া থাকে। নতুবা রাজকারাগারে বন্দী ইউক্লিডের মস্তিষ্কে জ্যামিতি-তত্ত্বের আবিষ্কৃতি হইবে কেন? বন্দীদশায় স্যার্ ওয়াল্টার র‍্যালে বিখ্যাত ইউরোপের ইতিহাস প্রণয়নে সক্ষম হইবেন কেন? আর কার্য্যকারিতাই মহত্ত্বের মূলসূত্র না হইলে দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্র বা বাষ্পীয়-যান জগতে আজ কে দেখিতে পাইত? কে জানিতে পাইত, বাল্মিকী-ব্যাসের নাম? কে শুনিতে পাইত, গ্যাবিবল্‌দী-ওযাসিংটন?

মহতেরা না নামপ্রার্থী, না যশঃপ্রয়াসী। নীচহৃদয়ই নাম ও যশের ভিখারী। কিন্তু কি ঐশ্বরিক লীলা, অনায়াস সত্ত্বেও মহতের নাম আপনাপনিই জগতে প্রচারিত হইয়া পড়ে; আর অধমের নাম বহু আয়াসেও লোপ পাইযা যায়। মহৎ কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধেও এই নিয়ম ঘটিয়াছে। তিনি আপনার নাম বাড়াইতে চেষ্টা করেন নাই, অথচ তাঁহার নাম আজ আপনাপনিই জগতে প্রতিধ্বনিত হইতে চলিযাছে। কৃষ্ণমোহন আপনার নাম বাড়াইতে আপনি চেষ্টা তো করেন নাই, উপরন্তু অন্যে চেষ্টা পাইলে তিনি তাহাতেও বাধা দিয়াছেন। লোকে কৃষ্ণমোহনের জীবন-চরিত লিখিবার জন্য তাঁহার নিকট জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইতে যাইতেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন তাঁহাদিগকে আপন জীবনের ঘটনাবলী বিশিষ্টরূপে অবগত করাইতেন না; 'জীবনী লিখিব' বলিয়া কেহ তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিতে যাইলে তিনি স্বতঃই তাঁহাদিগকে বলিতেন, "এ পৃথিবীতে আমি কীটাণু। আমার জীবনে কি মহত্ত্ব আছে যে, আপনারা তাহা সাধারণে প্রচার করিবেন?" অধিক বলিব কি, শুনিলাম কৃষ্ণমোহনের এক-খানি বিস্তৃত জীবন-চরিত সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার বিদুষী কন্যা

মনমোহিনী হুইলারও অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু কোন-ক্রমে তিনিও পিতার নিকট হইতে আশানুরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। প্রধানতঃ স্বনামখ্যাত পুরুষগণ স্বাখ্যায়িকা (Auto-biography) লিখিয়া থাকেন ; জগৎ তাহা হইতেই তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া লয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, কেহ জীবন-চরিত লিখিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিবে বলিয়া, শুনিয়াছি, কৃষ্ণমোহন এইরূপ স্বাখ্যায়িকাও লিখিয়া যান নাই *। জগতে এরূপ উচ্চ-হৃদয় কয়জনের আছে ? লোকের নিকট স্বনাম ধ্বনিত হউক, জগতে এ বাসনা কাহার নাই ? কত-কাংশে মহারাষ্ট্র-মহিষী অহল্যাবাইএর হৃদয়ও এইরূপ ছিল। শুনিয়াছি, কোন একব্যক্তি জীবদ্দশায় তাঁহার একখানি প্রশংসাপূর্ণ জীবন-চরিত প্রণয়ণ করেন ; অহল্যারাণী সে পুস্তক-খানি দেখিতে পাইয়া "এরূপ নামে আমার কায নাই" এই বলিয়া তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করেন। অনেক স্থলে মহৎ-হৃদয় প্রায়ই স্বাখ্যায়িকা লিখিয়া যান না, আপন কাহিনী লিখিতে গিয়া মনের ভাব স্বভাব-দোষে গুণাবলী অতিরঞ্জিত করিলে জগৎকে বঞ্চনা করা হইবে, প্রায়ই এই আশঙ্কায় মহাজনেরা স্বাখ্যায়িকা লিখিতে চান না। এই হেতু আমাদের দেশে এরূপ স্বাখ্যায়িকার (Autobiography র) সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

---

*এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণমোহনের জীবনী সংগ্রহ করিতে যাইলে তাঁহার কন্যা মনমোহিনী হুইলার আমাদিগকে তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দেন ও তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লেখার অন্তরায়ে এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, একসময়ে একটি বালক লোকের পাশা-ক্রীড়া দেখিয়া তাহা অনুকরণ করিতেছিল। মহাত্মা প্লেটো তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে তিরস্কার করায়, সে বালক বলিল, "আমি এরূপ তীব্র তিরস্কারের উপযোগী দোষ তো করি নাই!" তদুত্তরে প্লেটো বলিলেন, "তাহা কর নাই সত্য, কিন্তু কু-অভ্যাস সামান্য জিনিষ নহে।" কৃষ্ণমোহনের চক্ষে প্লেটোর ন্যায় প্রকৃতিদেবী সততই কু-অভ্যাসের কুফল দেখাইয়া দিতেন। সে ফল দেখিয়া তিনি বালকবয়স হইতেই অসৎ-অভ্যাসে ঘৃণা ও সদভ্যাসের অনুরাগী হইয়াছিলেন; কি সামাজিক, কি নৈতিক, সকল বিষয়েরই তিনি অসদ্ভাগ ত্যাগ করিয়া সদ্ভাগ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ব্যসনী ব্যক্তি জগতে মানুষ-পশুর দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণমোহনের ইহা সম্যক স্মরণ ছিল। এইহেতু তিনি মদ্যপান কিম্বা অন্য কোন প্রকারের ব্যসন-বাসনায় অভ্যস্থ হন নাই।

কৃষ্ণমোহনের ধর্ম্মভাব কিরূপ? তিনি ধর্ম্মের কিরূপ উপাসক ছিলেন? এ কথার উত্তরে হিন্দুর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে, সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণমোহনকে অহিন্দু বলিতে হৃদয় বিষম শেলে বিদ্ধ হয়। কিন্তু কি করিব?—এ ক্ষোভের আর অবসান নাই; ঘটনাচক্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর অন্তরায় দেখি না। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগী হইয়া যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন তাঁহার মন ঈশার সেই পবিত্র ধর্ম্মেই দীক্ষিত ছিল। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক ডফ্ সাহেবের মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমতঃ "স্কট্ল্যাণ্ডীয় কার্ক" সম্প্রদায়-ভুক্ত (The Kirk of Scotland) হন। তৎপরে সে মতের সহিত স্বমতের অমিল হওয়ায় তিনি বয়স্থ হইয়া

"ইংলণ্ডীয় এপিস্কোপ্যাল চার্চ্চের" (The Episcopal Church of England এর) উপাসকভুক্ত হইযাছিলেন *। যাহাহউক, ধর্ম্ম-বিষয়ে নামতঃ তিনি যে সম্প্রদায় ভুক্তই থাকুন না কেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব অতি উচ্চ অঙ্গেব ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মেরই বাহ্য আবরণ ভিন্ন, কিন্তু মূল সূত্র একই। তিনি জানিয়াছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এক, কেবল ভিন্নভাব উদ্বোধনে—লৌকিক দৃশ্যে। তাঁহাব ধর্ম্ম এই লৌকিক দৃশ্য বিবর্হিত—বাহ্য চাকচিক্যশূন্য, সে ধর্ম্মেব অন্তব জ্যোতিষ্মান্—অঙ্গাবাবৃত সমন্তকসদৃশ। কৃষ্ণমোহন বাহ্য আড়ম্বরে পবমেশ্বরের ভজনা কবিতেন না; তিনি অন্তবেব সহিত ভগবানকে ডাকিয়া তন্ময়চিত্তে সতত তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। নামতঃ তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্তবে তাঁহাব সেই আর্য্য ঋষিব ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান ছিল, তিনি পার্থিব অসারভাগ ত্যাগ কবিয়া ধর্ম্মেব সাবভাগ গ্রহণ কবিযাছিলেন। সাধাবণতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় ববিবাসরীয় লৌকিক ধর্ম্মোপাসনাকেই আপনাদেব মুক্তির প্রশান্ত পন্থা বলিযা স্থিবীকৃত বাখিযাছেন, সপ্তাহেব অপর কয়েক দিবস পার্থিব সাংসাবিক কার্য্যে অতিবাহিত কবিয়া ববিবাবেই তাঁহাবা ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও ঈশ্বরের উপাসনা কবিয়া

---

* কৃষ্ণমোহনেব ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অন্যমত আছে: ডিবোজিওর চরিত-লেখক বলেন যে, কৃষ্ণমোহন প্রকৃত প্রস্তাবে ডফের মত অনুসরণ করেন নাই,—বরং তিনি ডফের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডীয় এপিসকোপ্যাল চার্চ্চেরই (The Episcopal Church of England রই) উপাসক ছিলেন,—কখনও স্কটল্যাণ্ডীয় কার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত (The Kirk of Scotland) হন নাই।

থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে এ নিয়মের অনুবর্ত্তী রাখেন নাই। ববিবাসবীয় উপাসনা ভিন্ন তাঁহার প্রাত্যহিক উপাসনা ছিল,—তিনি প্রকৃত হৃদয়বান ধার্ম্মিকের ন্যায় সকল সমযেব সকল কার্য্যেব প্রাবম্ভেই ঈশ্ববেব নাম লইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবমেশ্ববেব উপাসনা করিতেন। ফলতঃ বাহ্য নাম-দৃশ্যে, হিন্দুব চক্ষে তাঁহাব ধর্ম্ম ঘৃণিত হইলেও, তাহা প্রকৃত ঘৃণার্হ নহে,—ববং পূজ্য। আব বাহ্য দৃশ্য ত্যাগ কবিয়া অন্তর্নেত্রে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায যে, জগতে মহৎ ব্যক্তিমাত্রেবই ধর্ম্মভাব এইরূপ স্বভাবগঠিত।

কৃষ্ণমোহন চিবদিনই দবিদ্রেব বন্ধু ছিলেন। জমীদাবেব পীড়ন বা বাজনির্য্যাতন হইতে দবিদ্রকুলকে বক্ষা কবিবাব জন্য তাঁহাব প্রাণ সততই চেষ্টিত থাকিত। যেখানে দরিদ্রেব বিপক্ষ মত বা দবিদ্র-পাড়ন-প্রশ্রয, কৃষ্ণমোহন কোনক্রমেই সেখানে সংলিপ্ত থাকিতে পাবিতেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভাব' সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। এ সভা জমীদার-সম্প্রদায়েব মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত; সকল বিষয়েই জমীদাবগণের রক্ষণশীলতা এ সভাব অভিপ্রেত ছিল। জমীদাবেব মুখপাত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিযান সভাব' এরূপ বক্ষণশীলতা কৃষ্ণমোহনেব বড়ই অসহ্য হয। তিনি ইহাঁদেব এরূপ ব্যবহাবে ত্যক্ত হইয়া কিছু দিন পরেই ইহাব সভ্যপদ ত্যাগ কবেন, দবিদ্রের মুখ চাহিয়া যাহাতে তাহাদেব উপকাবী হইতে পাবেন, এই তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল।

কৃষ্ণমোহন জগতে সম্মানপ্রাপ্তি বিষয়ে বাঙ্গালীর একজন প্রথম পথপ্রদর্শক। ধর্ম্মবিষয়ে, শিক্ষাসম্প্রদায়ে কিম্বা রাজ-

নৈতিক আন্দোলনে বাঙ্গালীব মধ্যে তিনি অনেক উচ্চপদ প্রথম পাইয়াছিলেন। ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালী-খৃষ্টানেব মধ্যে কৃষ্ণমোহন প্রথম আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষাসম্প্রদায়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে,বাঙ্গালীব মধ্যে তিনি ইংবাজী-সাহিত্যেব প্রথম পবীক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন ফ্যাকল্‌টি অব্‌ আর্টেব সভাপতি, কলিকাতা বিশবেব অবৈতনিক মাননীয় চ্যাপলেন, আসিয়াটিক্ সোসাইটিব সভ্য, ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজেব পবীক্ষক ও 'কম্প্যানিয়ন্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়াব' (C I E) নিযুক্ত হইযাও তিনি বাঙ্গালীব অনেক উচ্চ সম্মানেব পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। দবিদ্র সন্তান কালে এরূপ সমগ্র জাতিব পথ-প্রদর্শকত্ব পাইতে পাবে, চেষ্টা ও শিক্ষাব ইহাই মহত্ত্ব।

সচ্চবিত্র ব্যক্তি সকলেবই স্নেহেব পাত্র। কৃষ্ণমোহন ইহাব একটি দৃষ্টান্ত। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধবযস পর্য্যন্ত আপনাব সচ্চবিত্রতাব কারণ কৃষ্ণমোহন যে সাধাবণেব স্নেহেব পাত্র ছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বালকবযসে তাঁহাব সচ্চবিত্রতাব গুণে তিনি হেযাব সাহেবেব প্রিযপাত্র হইয়াছিলেন, শিক্ষাব সমাজ-সমিতি হইতে সাহায্য পাইযাছিলেন। প্রসিদ্ধ খৃষ্টপুবোহিত বিশব উইলসন্ এই সুচবিত্রেব জন্য কৃষ্ণ-মোহনকে পুত্রেব ন্যায স্নেহ কবিতেন। এই বিশব উইলসনেব উদ্যমেই হেদুয়াব ধাবে খৃষ্টীয ধর্ম্মমন্দিব প্রস্তুত হয,—কৃষ্ণমোহন তাহার যাজকপদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, বিশব উইলসন্ একবার পশ্চিমাঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া তত্রত্য কোন মুসলমান বেগমের নিকট প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন, ও সেই প্রাপ্ত অর্থে হেদুয়াব গির্জ্জা প্রস্তুত কবাইয়া দেন। হেদুয়ার ধর্ম্ম-

মন্দির নির্ম্মাণের আরও কএকটি সাহায্যদাতা ছিলেন; স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন প্রভৃতি হিন্দু-কলেজের স্থাপয়িতা অধ্যক্ষগণ এই ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ ৮ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন *। ফলতঃ বিশপ উইলসনের একান্ত যত্নে ও এইরূপের সাহায্যে যে এই ধর্ম্মালয়টি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণমোহনের চরিত্রগুণেই বলিতে হইবে। কারণ চরিত্র-গুণে বিশপ উইলসনের সুদৃষ্টি না পাইলে সে সময় লোকে তাঁহার সাহায্য করিত কি না সন্দেহ।

সংক্ষেপেতঃ কৃষ্ণমোহন সর্ব্বগুণাধার। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, সৎসাহসী, আত্মনির্ভর ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি জগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষোভের বিষয়, এই সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণমোহন এখন আর নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে (১২৯২ সালের ২৯এ বৈশাখ) তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হইয়াছে, তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। মহতেরা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে সল্পায়ু হইয়া থাকেন, কঠিনা প্রকৃতি তাঁহাদিগের দীর্ঘ-জীবন দান করিতে যেন সততই কুণ্ঠিত। প্রকৃতির এই কঠিন হৃদয়ের কারণই বঙ্গমাতা তাঁহার মুখোজ্জ্বলকারী প্রিয় পুত্রগণকে অধিক দিন ক্রোড়ে রাখিতে পারেন

---

*এই ধর্ম্মালয়টি প্রথমতঃ হিন্দুকলেজের নিকট বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের উত্তরে, (এখন যেখানে স্বর্গীয় মহাত্মা শ্যামাচরণ বিশ্বাসের আবাসবাটি আছে) নির্ম্মিত হইবার কথা হয়। হিন্দুকলেজের সম্মুখে এরূপ খৃষ্ট-ধর্ম্মালয় নির্ম্মিত হইলে হিন্দু-যুবকগণ হিন্দুধর্ম্মচ্যুত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কলেজের অধ্যক্ষগণ হেদুয়ার নিকট ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত জন্য ঐ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

নাই ; চুয়াল্লিস্ বর্ষ অতিবাহিত হইতে না হইতেই মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার ক্রোড়ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে শয়ান লইয়াছেন ; পঁয়তাল্লিস্ বর্ষ বয়ঃক্রমে ধর্ম্মাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে, উনচল্লিস্ বর্ষ বয়ঃক্রমে ন্যায়বিচারক দ্বারকানাথ মিত্রকে, তিপান্ন বর্ষ বয়ঃক্রমে সত্যানুসন্ধায়ী রামগোপাল ঘোষকে ও একষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমে পরোপকারী দিগম্বর মিত্রকে কালের পীড়নে বঙ্গমাতার ক্রোড় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, আমাদের কৃষ্ণমোহনের প্রতি প্রকৃতিদেবী এ বিষয়ে একটু দয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; কৃষ্ণমোহনের বালকবয়সের কঠিন নির্য্যাতন-ক্লেশে সম্ভবতঃ মনব্যথা পাইয়া তাঁহার সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন। ফল কথা, কৃষ্ণমোহন ৭২ বর্ষকাল জীবিত থাকিয়া জননী-জন্মভূমির সেবা করিতে পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের পুণ্যাত্মা আজ দিব্যধামে—জননী-জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি আজ স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে। ইহজীবনে তিনি আমাদের হিতকারী বন্ধু ছিলেন, আজ পিতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া তিনি আমাদিগকে সেইরূপ বন্ধুভাবে দেখুন,—পিতার নিকট আমাদের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করুন, তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা। আর পরমপিতঃ! সে মর্ম্মবেদন শুনিয়া আপনি আমাদের সহায় হউন ; কি সম্পদে, কি বিপদে আমরা যেন আপনার প্রতি অনুরাগী থাকি ; অসৎপথ ভুলিয়া, সৎপথে বসিয়া, পিতা বলিয়া যেন সর্ব্বদা আপনার উপাসনা করিতে পারি !

১২৯২ সালের ২৯এ বৈশাখের সোমবাসরীয় কালরাত্রি ; এই কাল বৈশাখীর কাল রাত্রিই কৃষ্ণমোহনের কালস্বরূপা। বঙ্গ আলো করিয়া যে আলোক এতদিন জ্বলিতে ছিল, চৌরঙ্গী

লেনে—৭সংখ্যক ভবনে, এই কাল নিশার তামসী ছায়ায় সে আলোক মিশিয়া গিয়াছে ;—নৈরাশ্য-মেঘে নৈশান্ধকারে সমুজ্জ্বল সূর্য্য চির-অস্তমিত করিয়াছে। এ সূর্য্য অস্তাচলাবলম্বী হইবার কারণ—এ প্রজ্জ্বলিত দীপ নির্ব্বাণের প্রকৃত তত্ত্ব—এ মৃত্যুর মূলসূত্র সারা জীবনের কঠোর পরিশ্রম-ক্লেশ। যে পরিশ্রম কৃষ্ণ-মোহনকে অসময়ে আসন্ন-মৃত্যু-গ্রাস হইতে বন্ধুর ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল, যাহার কারণ জগতে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃতি পাইয়াছে ; বলিতে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়, যে, তাঁহার সেই অসময়ের বন্ধুই এই মৃত্যুর কারণ। সমগ্র জীবনের কঠোর শ্রমে, মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্ব্বে কাল পীড়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিল, সে কঠিন আক্রমণ হইতে তিনি আর নিষ্কৃতি পাইলেন না। কত ডাক্তারের চিকিৎসা হইল, কত ঔষধই সেবন করান যাইল, কিন্তু কিছুরই ফল ফলিল না,—সে রোগের প্রকৃতি নিদ্ধারিত হইল না।

আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এ রোগের প্রকৃতি বড়ই ভীতি প্রদায়িনী ছিল। মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্ব্বেই তাঁহার হৃৎপিণ্ড-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল,—মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হইত। এ উপক্রমণে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও রোগের চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এ সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসার উপশম হইল না, দিন দিন জরায় তাঁহার দেহ অবসন্ন করিয়া আনিল। এই অবসন্নতাই তাঁহার মানব-জীবনের অবসান-লগ্ন, স্বর্গীয় জনমের প্রারম্ভ কাল। কিয়দ্দিন এই রূপ অবসন্নভাবে থাকিয়া তিনি একেবারে জীবন-লীলার অবসান করিয়াছেন,—অনন্ত-পিতার অনন্ত-ক্রোড়ে শয়ান লইয়াছেন।

মৃত্যুর পর, কৃষ্ণমোহনের অন্তেষ্টি-ক্রিয়া। হিন্দু জীবন এ ক্রিয়ায় যোগ দিতে পাইলেন না ; 'পাষণ্ড' বলিয়া কৃষ্ণমোহনকে সমাজচ্যুত করিয়া—পতিত জ্ঞানে স্নেহ না দেখাইয়া তাঁহারা যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, আজ এ দৃশ্যে সে কর্ম্মের মর্ম্মবেদনা পাইলেন। সে অন্তেষ্টি-ক্রিয়া হিন্দুরীতির পরিবর্ত্তে খৃষ্ট-নীতি-ক্রমে সম্পাদিত হইল ; সে পবিত্র দেহ ব্রাহ্মণযাজক কর্ত্তৃক পুণ্যময়ী গাঙ্গিনীর পবিত্র নীরে ভাসমান হইবার পরিবর্ত্তে, খৃষ্টযাজক কর্ত্তৃক সমাধি-প্রাঙ্গনে ঈশার পবিত্র মন্ত্রে মৃত্তিকা-প্রোথিত হইল। কৃষ্ণমোহনের সমাধি-ক্ষেত্র, শিবপুরে—ভাগীরথাতীরসংস্থিত 'গোর-স্থান'। যে ক্ষেত্রে আজ সপ্তদশ বর্ষ গত হইল, তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী সমাধিস্থ থাকিয়া স্বর্গনিকেতনে যাইবার জন্য সহচর স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সমাধি-স্থানেই কৃষ্ণমোহনের শব সমাধিস্থ হইল, স্বর্গগমন জন্য দুইপ্রাণ একপ্রাণে মিশিয়া গেল। সমাধির পূর্ব্বে কলিকাতার মাননীয় বিশপ শবের-প্রক্কালিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করেন, তাঁহার মন্ত্র উপমন্ত্রের পর সে দেবমূর্ত্তি মৃত্তিকা-মগ্ন হয়। কবিবর মহাত্মা মাইকেল মধুসূদনের সময়েও এই ভাব ঘটিয়াছিল, দুরদৃষ্ট-ক্রমে হিন্দু তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দিতে পারেন নাই—সে ক্রিয়াও এইরূপ খৃষ্টমন্ত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণমোহনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অতি নীরবেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল ; মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সাধারণ সমাজে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত না হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকলে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার মৃত মূর্ত্তির পূজা করিতে পারেন নাই। রাত্রি-কালে মৃত্যু হওয়ায় ও ঊষা-আগমনেই তাঁহার মৃত মূর্ত্তি সমাধি

স্থলে লইয়া যাওয়ায় কেহই সে মৃত্যু-লগ্নে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমোহনের প্রতি লোকের যেরূপ অচলা ভক্তি, তাহাতে বোধ হয়, যদি এ সংবাদ পূর্ব্বে প্রচার হইত, তবে লক্ষ লক্ষ লোক বিষণ্ন মনে—ম্লান বদনে—পদব্রজে সে দেহের অনুগমন করিত,—ক্রন্দনের বিষম জলপ্রপাতে 'গোর-স্থান' সিক্ত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হয় নাই,—মায়া-নিদ্রায় মগ্ন ঘুমঘোরে অচেতনপ্রায় মানবের কর্ণে এ মর্ম্মভেদী ধ্বনি সময়ে ধ্বনিত হইতে পায় নাই। আর এ ধ্বনি ধ্বনিত হয় নাই বলিয়া, কৃষ্ণবসনমণ্ডিত কৃষ্ণ-তুরঙ্গম-পরিচালিত সে কৃষ্ণশববাহী শকটের * পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশানুরূপ লোকেরও সমাগম দেখা যায় নাই।

সত্য বটে, এ সময়ে আশানুরূপ লোকের সমাগম হয় নাই; কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এ মৃত্যুতে ক্রন্দন করে নাই এমন লোক তো দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষে এমন জাতির নাম শুনি নাই, বঙ্গদেশে এমন জাতি আছে কি না সন্দেহ, যাহারা এ মৃত্যুতে আপনাদের মর্ম্মভেদী শোক প্রকাশ করে নাই। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কি উড়িয়া, কি পশ্চিমবাসী সকলেই এ বিয়োগ-ক্লেশে কাঁদিয়াছে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে গভীর শোক ধ্বনি তুলিয়া সকল জাতিই হৃদয়ের বিষম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে।

* এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্ট ধর্ম্মক্রমে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদই শোকচিহ্ন। আর এই শোক দেখাইবার জন্যই এইরূপে মৃতদেহ কৃষ্ণবসনমণ্ডিত ও কৃষ্ণ তুরঙ্গমচালিত শকটে আরোহিত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। কৃষ্ণমোহনের মৃতদেহও এই প্রথাক্রমে এইরূপে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

মৃত্যুসংবাদ পরে প্রচারিত হইলে দেশের সভা-সমিত, তাহার গোর-স্থানের নিকট গিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—সম্বাদ-পত্রসম্পাদকগণ বিষম দুঃখব্যঞ্জক গগনভেদী ক্রন্দনে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ দিগন্তব্যাপী শোকপ্রবাহ—এরূপ সর্ব্বব্যাপী সন্তাপোচ্ছ্বাস জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অজ্ঞাত বংশে জন্মিয়া, সামান্য জলবুদ্বুদ হইতে কালে বিশাল বারিধি সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণমোহন যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, এ ক্রন্দন সে মহত্ত্বেরই উপযোগী। মহত্ত্বের অনুষ্ঠাতা মহতের বিয়োগেই জগৎ এরূপ ক্রন্দন কাঁদিয়া থাকেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগী হইবার পর কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক সংসারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, ও সে পরিবারভুক্ত জীবন সংসারচক্রে কিরূপে পরিচালিত হইতেছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অবতারণা করা হয় নাই। সুতরাং এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ সময়ে কৃষ্ণমোহনের জননী শ্রীমতীই সে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই সস্নেহ পরিচর্য্যায় সে সংসার কিয়দ্দিন পরিচালিত হইয়াছিল। শ্রীমতী স্বভাবতঃই নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন, বিশেষতঃ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তাঁহার হৃদয়ের নিষ্ঠাবতী ভাব আরও পরিসর লাভ করিয়াছিল,—এই খৃষ্টাব্দে পতি পরলোকগামী হইলে, তিনি হিন্দু-বিধবার বৈধব্যোচিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৃষ্ণমোহনের গৃহত্যাগের পর, সে পুত্রবিচ্ছেদ-ক্লেশ এ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল,—এ ক্লেশে তিনি আনকাংশে সংসারমায়া ত্যাগ করিয়া আপনাকে সেই ইষ্টদেব পরমেশ্বরের আরাধনায় বিভোর রাখিয়াছিলেন।

শ্রীমতীর হৃদয় প্রকৃত আস্তিকভাবে পূর্ণ ছিল। শ্রীমতী এক সময়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীক্ষেত্রে আরাধ্য জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পবিত্রমনা আস্তিক হিন্দুগণ সাধারণতঃ পদব্রজেই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন করেন,—এ রীতি আজি পর্য্যন্তও তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, যে শ্রীমতীও এই রীতিক্রমে কলিকাতা হইতে পুরীনগরীতে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কোমল প্রাণ নারী-প্রকৃতিও ভক্তিপ্রেমে মাতিয়া এ দিবারাত্রিব্যাপী পর্য্যটন-ক্লেশে ভ্রূকুটি দেখাইয়াছিল। আরও বিস্ময়ের কথা যে, পদব্রজে পুরীগমন কালে তিনি একদিনের জন্যও অন্নাহার করেন নাই, ধর্ম্ম চাহিয়া ঈশ্বরে ডাকিয়া তিনি এ পর্য্যটন সময়ে ফলমূলাহারী থাকিয়াছিলেন। কত সময়ে নিদাঘের দুরন্ত তাপে ক্ষুধায় তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শ্রীমতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, "হা অন্ন যো অন্নের" পরিবর্ত্তে "হা পরমেশ্বর, হা পিত!" বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। ফলতঃ নারী-হৃদয়ের এরূপ সুদৃঢ় ধর্ম্মভাব অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পই দেখা যায় বলিয়া সে সময়ের লোকে তাই শ্রীমতীর নাম 'যতিনী বামনী' রাখিয়াছিলেন। আজ হিন্দু-গৃহে এরূপ 'যতিনী' কই?

'যতিনী' শ্রীমতীর আবার পুত্র-পালন-মহত্বও প্রশংসনীয়। পুত্রের গুণাগুণ জননীর উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। পুত্রের চরিত্র-গঠন জননীর আয়ত্তাধীন। শৈশব-জীবনে পুত্রকে সৎপথ না দেখাইয়া দিলে, উন্নতি ও অবনতির সুখদায়ী ও দুখদায়ী পন্থা না চিনাইলে পুত্র কখনই সন্নাম ও সৎ-

খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। যে জননী পুত্র প্রতি আপনার এই কঠোর কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া পুত্রের উন্নতি-ইচ্ছায় যত্নবতী হন, এ জগতে তিনিই ধন্যা! কৃষ্ণমোহনের জননী এ সন্তান-পালন বিষয়ে আদর্শস্থানীয়া। তিনি প্রথম হইতে আপনার এ পুত্র-পালন-কর্ত্তব্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার সন্তান কৃষ্ণমোহনের এত সম্মান—এত সংখ্যাতি। তাঁহার সে দরিদ্র সংসার পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দানের বড়ই অন্তরায় ছিল, কিন্তু শ্রীমতী সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহাতে সন্তানগণ বিদ্যালাভ করিতে পারে, সতত সেই জন্যই চেষ্টিত ছিলেন। "কোন্ পাঠশালে, কিরূপে, বিনা-বেতনে পুত্রগণের পড়িবার সুবিধা হইতে পারে বা কাহার নিকট হইতে কোন্ উপায়ে তাহাদের পাঠ্য-পুস্তক সংগ্রহ করা যায়" তাঁহার মনে সততই এই ভাবনার স্থান পাইয়াছিল। এইরূপ ভাবনা ও এ ভাবনা নিবারণের চেষ্টাই কৃষ্ণমোহন প্রভৃতির উন্নতির মূলসূত্র। ফলতঃ শ্রীমতীর এরূপ পুত্র-পালন-কর্ত্তব্য-জ্ঞান না থাকিলে, আজ আমরা কৃষ্ণমোহনের নাম ও শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মহতের জননীগণ প্রায়শঃই এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। জন্‌সন্ বা ওয়াসিংটন্, ক্রমওয়েল বা ওয়েলিংটন্, বেকন্ বা ওয়েলেস্‌লি, এ সকলেই এইরূপ জননী পাইয়াছিলেন। আর এইজন্যই বোধ হয়, মহাত্মা নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি সর্ব্বদাই বলিতেন, "পুত্রের সুখ দুঃখ ও কুচরিত্র-সুচরিত্র তাহার জননীর উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে।"

কৃষ্ণমোহনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর শ্রীমতী অতি অল্পদিন-

মাত্র জীবিত ছিলেন, যতিনীকে যতিনী ভাবে থাকিয়া শীঘ্রই জরায় তনুত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন যে সময় হেদুয়ার ধর্ম্মমন্দিরে খৃষ্ট-পৌরহিত্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়েই শ্রীমতী মানবী-লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বরাবরই শ্রীমতীকে সভক্তি-প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জননীকে অর্থ সাহায্য করিয়া ও তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন। শ্রীমতীর ভাগ্যে এ পরিতোষ-প্রাপ্তি অধিক দিন ঘটে নাই, ইহার অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয়ে কি আছে? ফলতঃ আপনি এরূপ সুকৃতী হইলে, পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায়, কৃষ্ণমোহন যে কি গভীর মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

গৃহত্যাগী হইবার পর, কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভুবনমোহন সে সংসারের পরিচালক ও রক্ষণকর্ত্তা ছিলেন। ভুবনমোহন প্রথমে কলিকাতার আদালতে মকর্দ্দমার 'আরজী' লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন, ইহার পরে তিনি যশোহরে 'দারগাগিরি' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু এই সকল আয়ে ও কৃষ্ণমোহনের গুপ্ত-সাহায্যে সে সময়ে সে সংসারকে আর কোন কষ্টের মুখ দেখিতে হয় নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন মানব-লীলা সম্বরণ করেন। এই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভারত-শাসন সময় 'প্রথম' কাবুল-বিগ্রহে-ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন এ সময়ও হেদুয়ার ধর্ম্মমন্দিরে যাজকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ভুবনমোহনের উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান ছিল না,—সে সময় গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামীয় তাঁহার একটি জামতা

মাত্র বর্ত্তমান ছিল।। সুতরাং মৃত্যুর পর হইতে এই জামাতাই ভুবনমোহনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। গিরীশচন্দ্র * এখন প্রবীণ-বয়স্ক। পুত্র পৌত্রাদি পরিবার সহ ইনিই এখন কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক আবাস-বাটি—গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটের ১১ নম্বর ভবনে বাস করিয়া থাকেন।

। কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কালীমোহন। কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ইনিও সামাজিক বৈষম্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আপনি খৃষ্টমন্ত্রের দীক্ষা লইয়াছিলেন। কালীমোহন পৈতৃক বাসস্থানে বাস করিতে পান নাই, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ হেতু তাঁহাকেও পৈতৃক ভবনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। কালীমোহন এখনও জীবিত আছেন। "ইহাঁর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ইহাঁকে যোগ ঋষি বলিয়া মনে হয়।

সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, জগতের এই নিয়ম। প্রধানতঃ দেখিতে যাইলে কৃষ্ণমোহনের জীবনও এই নিয়মক্রমে পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার বালকবয়সের দুঃখের বিষয় স্মরণ করিলে যেমন হৃদয় ক্ষোভে ও বিষাদে আপ্লুত হয়, তাঁহার ক্রমবার্দ্ধক্যের বিষয়ও তদনুরূপ হৃদয়কে শান্তি-সুখের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে দেয়। তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রথম বয়সে তাঁহাকে যেমন একটি কপর্দ্দকের অভাব-ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, শেষ বয়সে তিনি সেইরূপ সহস্র সহস্র টাকার অধীশ্বর-সুখ প্রাপ্ত হইয়া

* কৃষ্ণমোহনের জীবনী সংগ্রহ করিতে যাইলে ইহাঁর আমায়িক ব্যবহারে আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি ও ইনি, কৃষ্ণমোহনের জীবনী-সংগ্রহের অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

ছিলেন। শেষ বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিবার পরও, কৃষ্ণমোহন ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা পেনসনস্বরূপ বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। আরও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষক ছিলেন, এ পেনসন বৃত্তি ব্যতিত ইহাতেও তাঁহার বার্ষিক প্রায় প্রায় ২০০০ দুই সহস্র টাকা আয় হইত।

এ সময়ে কৃষ্ণমোহনের আরও অনেক প্রকারের আয় ছিল। যাঁহারা বিলাত হইতে সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেন, তাঁহাদের দেশীয় ভাষা পরীক্ষার ভার কৃষ্ণমোহনের উপর ন্যস্ত ছিল। এরূপ সম্মানব্যঞ্জক পরীক্ষক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি মাসিক ২০০ দুই শত টাকা বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির কাগজের সুদ ও বাড়ীর ভাড়া স্বরূপ কৃষ্ণমোহনের অনেক টাকা আয় হইত। ফলতঃ অন্নে ভিখারী পতিত দরিদ্রের অবস্থা হইতে কালে এরূপ আয় বিস্তৃতি করা বিদ্যা ও বুদ্ধির অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বলিতে হইবে।

কৃষ্ণমোহনের কন্যা দুইটিই এখন তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; পুত্র-সন্তান না থাকায় এ সকল সম্পত্তি এখন তাঁহার কন্যাদ্বয়ের অধিকারেই আসিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, এখন তাঁহারা সদ্ভাবে থাকিয়া পিতার নাম ও কীর্ত্তি রক্ষ করিতে সচেষ্টিত থাকুন, ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই অন্তরের প্রার্থনা। কিন্তু মনে বড়ই সন্তাপ রহিয়া গেল, যে আমরা আর এ সংসারকে 'আমাদের কৃষ্ণমোহনের সংসার' বলিতে পারিলাম না। যে দিন কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সে সংসারকে আর 'আমাদের কৃষ্ণমোহনের সংসার' না বলিবার কথা; কিন্তু তাঁহার অমায়িক

ভ্রাতৃভাব,—স্বভাবজাত স্বদেশহিতৈষিতা আমাদের কঠিন প্রাণের কোমলত্ব দিয়াছিল,—আমাদিগকে তাহা না বলিয়া থাকিতে দেয় নাই। কিন্তু আজ আর তাহা পারিতেছি না, স্মরণে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে যে, সে সংসারকে আজ 'আমাদের কৃষ্ণমোহনের সংসার' বলিবার দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে। মনের ক্ষোভ রাখিব কোথায়, যে সে পরিবার আজ য়ুরোপ পরিবারে ভুক্ত প্রায়,—সে সংসার আজ য়ুরোপীয় সংসারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পরমপিতার লীলাই কি এই? আমরা যাহার জন্য কাঁদিতেছি, সে আমাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিবে না, এই কি ঐশ্বরিক নিয়ম? যাহাই হউক, আর দুঃখ প্রকাশে কি ফল ফলিবে? পরিবর্ত্তন-চক্রের প্রতিকূল ঘূর্ণনে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহার আর নিরসন হইবে কি প্রকারে? এখন অন্তরে যতই বেদনা পাই না কেন, হৃদয় যতই ক্ষোভে সিক্ত হউক না কেন, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। ঘটনা না ফিরিয়া আসে, না আসুক, কিন্তু কৃষ্ণমোহন আমাদের ভুলিবার বস্তু নহেন, তিনি স্বদেশীর ও বিদেশীর সকলেরই সমভাবে স্মরণীয়। কৃষ্ণমোহনের বিধর্ম্মিত্ব গ্রহণ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী পরিবারের য়ুরোপীয় ব্যবহার আমাদের যতই দুঃখ দিউক না কেন, তাঁহার উপকার তো আমরা ভুলিতে পারিব না! কৃষ্ণমোহন যে আমাদের বন্ধু ছিলেন। সুতরাং যেখানে থাকুন, আর যে রীতিক্রমেই চালিত হউন, সে বন্ধুর পরিবার শান্তি-সুখের আশ্রয় পাউন, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।

আশাই মানবের জীবন,—চেষ্টাই মানবের মহত্ত্ব। যাহারা

আশালতা অবলম্বন করিয়া চেষ্টামার্গে সতত পরিভ্রমণ করিতে পারে, জাগতিক নীতিক্রমে মহত্ত্ব তাহাদেরই অঙ্কশায়ী,—কারণ এ জগতে তাহারাই মহৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। কৃষ্ণমোহনের জীবন এইরূপেই মহত্ত্ব পাইয়াছে,—জগতে সকল মহতের মহত্ত্বই এইরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জগৎপাতা পরমেশ্বরের রাজ্যের এই নিয়ম,—পিতার আজ্ঞা, "নিরাশ হইও না, উদ্ধার পাইবে," —এ নীতি তাঁহারই সৃষ্ট মহত্ত্বের সূত্র। এ নীতি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলে কোথাও ভয় পাইতে হইবে না, হিংস্র জন্তুপূর্ণ রাজনীতির ভয়ঙ্কর কাননেই যাও কিম্বা তিমি-নক্রশঙ্কুল সমাজ-সাগরের ভীষণ আবর্ত্তেই পতিত হয় অথবা ধর্ম্ম জগতে যাইবার অন্তরায় পাপ প্রলোভনই পাও, এ নীতিক্রমে চলিলে কোথাও ভয় নাই। ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে, পিতার আজ্ঞা, "নিরাশ হইওনা,—তাহাকে পরাস্ত করিয়া মুক্তি পাইবার চেষ্টা পাও,—উদ্ধার পাইবে।" মহাসমুদ্রবক্ষে তরণী আসন্নমগ্না—হাবু ডুবু খাইতেছে, "ভয় নাই," পিতার আজ্ঞা, "ক্ষেপণী ধর,—উদ্ধার পাইবে।" ধর্ম্ম-জগতে যাইবে, অন্তরায় পাপ প্রলোভন, পিতার আজ্ঞা, "প্রাণান্তপণে প্রলোভনের কুহক হইতে অন্তরে যাইতে চেষ্টা পাও,—অনায়াসে উদ্ধার পাইবে, নরকের পাপ আগ্নেয় কীট তোমার অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারিবে না।" কিন্তু ভ্রান্ত মানব যে আমরা। কি করিব, এ আজ্ঞা যে আমরা স্মরণ রাখিতে পারি না। ক্ষণিক সম্পদসুখে মিশিয়া এ আজ্ঞা আমরা ভুলিয়া থাকি,—চির-দারিদ্র্য-দুঃখে ডুবিয়াও এ আজ্ঞা আমরা স্মরণে আনিনা! বুঝিনা, প্রাণের কেন এরূপ ভাব? জানিনা, মনের মনের কেন এরূপ বিস্মৃতি? পরমপিত! তুমিই

তো ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমার সৃষ্ট মনের—তোমার গঠিত প্রাণের কেন এরূপ বিরূপ ভাব? সন্তান বলিয়া, স্নেহের নেত্রে দেখিয়া বল বল পিত। এ সর্ব্বনাশী বিস্মৃতির কিরূপে অবসান হইবে? অনাথের নাথ। পতিত আমরা, আমাদের ভবিষ্যের উপায় কিরূপে পাইব?

সম্পূর্ণ।

NOTICE

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত

দ্বাদশ নারী। এখানি একখানি বৃহদাকারের বিশুদ্ধ স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক। মূল্য, উপহার দিবার উপযোগী স্বর্ণনামাঙ্কিত সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই ৸০ বার আনা। কাগজের মলাট, ॥৵০ দশ আনা।

নির্ব্বাণ-জীবন। এ খানি সুবিখ্যাত ইংরাজী কবি গ্রে-রচিত 'এলিজির' ভাব-মূলক বাঙ্গালা পদ্য। মূল্য ৵০ আনা।

ভারতে দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসব উপলক্ষে লোকের মনোভাব ও কার্য্যভাব কিরূপ হয়, এখানিতে সরল কবিতায় তাহাই বর্ণিত আছে। মূল্য ⁄০ এক আনা।

আদর্শ-চরিত।—কৃষ্ণমোহন। এখানি স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

* * * এই সকল পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TESTIMONIALS

দ্বাদশ নারী।

"This handy little vernacular book contains biographical notices of twelve eminent native ladies, namely ;—Tara Bai, Jabhar Bai, Panna, Durgābati, Ahalya Bai, Bidula, Behula, Rashmani, Bhabani, Maharani Jhindan, Padmini and

Lakshmi Bai Most of these ladies have been immortalised by the magic pen of historians and are held in a very high estimation by the natives who entertain an affectionate pride of their glorious past The author of the present biographical treatise deserves our warmest thanks for having rendered into Bengali the eventful characters of some of the exemplary females of India We request the educational authorities to introduce this entertaining, as well as instructive biographical reader as a text-book for the girls of this province "—*The News of the day*, 26*th August*, 1885

"This is a Bengali treatise, giving brief historical sketches of twelve distinguished Indian ladies, namely, Tarabai, Zabahar Bai, Panna, Ahalya Bai, Durgabati, Bidula, Lakshmi Bai, Rani Bhabani, Padmini Behula, Rasmani, Maharani Jhindun The treatise is written with care and good taste can be confidently recommended to Hindu ladies Some of the chapters had previously appeared in different periodicals."—*The Indian Nation*, 1*st June*, 1885

"The book before us contains short accounts of twelve Indian ladies of eminence, of whom eight are recruited from the heroic fields of Rajputana, *Maharashtra*, *Jhansi*, *Garmandal and ancient Soubir** and one (the mother of Maharajah Dhulip Singh) gleaned from the comparitivelyrecent history of the Punjab war The work is intended to resent to the lady readers of Bengal model lives of eminent Aryan women In this respect the lives of Behula of semi-classic fame and of Rani Bhabani and Rani Rasmani of moderen Bengal will be found to be of especial interest to the ladies A work of the nature, taken in hand by the young writer, is a real necessity of the day, the author deserves praise for all that he has done The book under notice contains some neatly-executed illustrations." *The Indian Mirror*, 6*th*, *June*, 1885

---

*The italicised words are of the publisher.

"আজি কালি আমাদের বঙ্গ-মহিলাগণের বিদ্যানুশীলনের স্রোত দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাঁহাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহাদের উন্নতি-সাধনেচ্ছায় যাঁহারা অতি সামান্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ। মহৎ লোকের জীবনী অধ্যয়ন, চরিত্র-গঠনের এক প্রধান উপায়, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এইরূপ আলোচনায় হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং সদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইয়া মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়। এই কারণেই সভ্যসমাজে জীবনীর এতাধিক আদর। আজি কয়েক বৎসর হইতে আমরা বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখানি জীবনী প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহা দ্বারা আমাদের অভাব-সমুদ্রের এক গণ্ডূষমাত্রও পূর্ণ হয় নাই। তবে পূর্ব্বে একখানিও দেখিতে পাওয়া যাইত না, আজি কালি দুই একখানি দেখিতে পাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে সকল জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পৌরাণিক ও বিদেশীয়। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জীবনীই আমাদের মহিলাগণের বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমাদের কুলবালাগণের অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা।

তারাবাই, জবহর বাই, পান্না, মহারাণী অহল্যা বাই, দুর্গাবতী, বিহুলা, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই, রাণী ভবানী, সুরসুন্দরী পদ্মিনী, বেহুলা, রাণী রাসমণি, মহারাণী ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতী এই বারটি আদর্শ নারীর জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা লইয়া এই পুস্তক বিরচিত। তারাবাই, জবহর বাই, দুর্গাবতী, বিহুলা, লক্ষ্মীবাই এবং মহারাণী ঝিন্দন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বীরো-

চিত যুদ্ধ করিয়া শেষে অকাতরে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন দিয়া- ছিলেন। পদ্মিনী অসামান্য কৌশলে নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়া স্বামীকে শত্রুশিবির হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বেহুলা অসাধারণ পতিভক্তি, একনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সর্পদষ্ট স্বামীকে বাঁচাইয়াছিলেন। রাণী ভবানী ও অহল্যা বাই রাজ- নীতিকুশলা, পরোপকারিণী ও দয়াবতী ছিলেন, এবং অত্যন্ত বিশৃঙ্খল সময়ে রাজ্যের সুশাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পান্না রমণী-জীবনের স্বার্থশূন্যতার মূর্ত্তিমন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি অম্লান বদনে আপনার পুত্রের প্রাণ দিয়াও প্রভুপুত্রের প্রাণ রক্ষা করি- য়াছিলেন। রাণী রাসমণি বাঙ্গালী-রমণী হইয়া যেরূপে দরিদ্রের দুঃখ-মোচনার্থ পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজ উদ্দেশ্য ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য্য। এই দ্বাদশটি রমণীর জীবনী যথার্থই আদর্শস্বরূপ। ইহা দ্বারা আমাদের রমণীকুলের বিশেষ উপকার হইবে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। এই বিপ্লবময় ভারতে বাক্‌পটু অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালীর মনে বিশে- ষতঃ অর্দ্ধশিক্ষিতা বিলাসিনী বাঙ্গালী-রমণীদিগের চক্ষে এইরূপ আদর্শ-জীবন চিত্রিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপন্যাস, নাট্য- গীতি ইত্যাদি অসার বিষয়ে কালক্ষেপ না করিয়া এরূপ আবশ্য- কীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের হিতসাধন করিয়াছেন। আশা করি, তিনি আরও এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।” ইত্যাদি *।—সময়, ২৯এ বৈশাখ, ১২৯২।

* স্থানাভাবে বিস্তৃত সমালোচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াই এইরূপ “ইত্যাদি” বলিয়া শেষ করিয়াছি। শ্রী—প্রকাশক।

"এই গ্রন্থে তারাবাই, জবহর বাই, অহল্যা বাই, দুর্গাবতী, বিহুলা, লক্ষ্মীবাই, রাণী ভবানী, পদ্মিনী, বেহুলা, রাসমণি ও ঝিন্দনের জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "চরিত্রগঠনের প্রধান উপায় মহজ্জীবনীর অধ্যয়ন। * * * স্ত্রী-জীবনী স্ত্রী-চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। * * * অধুনা বঙ্গগৃহ, স্ত্রী-পাঠ্যনামীয় কতিপয় অপাঠ্য অশ্লীল পুস্তক দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।" গ্রন্থকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আজ কাল কতকগুলি লোকে কতকগুলি বীভৎস পুস্তক লিখিয়া "নারীর অবশ্যপাঠ্য" বলিয়া বড় চেঁচাচেঁচি করিয়া রাশি রাশি কলঙ্ক গৃহে গৃহে বিক্রয় করিতেছে, নবোত্থিত স্ত্রী-জাতির প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিতেছে। অল্পশিক্ষিতা নারীগণ নাটক নবেলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবার উপক্রম করিয়াছেন। সাধু নরনারীর জীবনচরিত পাঠে যে আনন্দ, সে আনন্দের কণামাত্র নারীগণ আস্বাদনে করিলে তাঁহাদের রুচি ফিরিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তেমন জীবন-চরিতের সংখ্যা অতি কম। দুর্গাদাস বাবু কয়েকটি নারীর জীবনচরিত লিখিয়া সেই অভাবের কিঞ্চিৎ পূরণ করিয়াছেন। আমাদের পুরুষগণ স্ত্রী-জাতিকে কামিনীফুল সাজাইয়া রাখিতে বড় ইচ্ছুক, নারী-জাতির প্রাণে, দুর্গাবতী বা লক্ষ্মীবাইর তেজস্বিতা দেখিয়া, ছি ছি! ধ্বনিতে চারিদিক শব্দায়মান করিয়া তুলেন। কাজেই কুসুমকোমলা, গলিত-হৃদয়া অবলার গর্ভে মেষপালের জন্ম হইতেছে। দুর্গাদাস বাবু তেজ-বীর্য্যপূর্ণ, উৎসাহময় নারী-চরিত প্রকাশ করিয়া সাধারণ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, দুর্গাদাস বাবুর আশা

সফল হউক। নারী-হৃদয় আবার তেমনই প্রাচীন কালের মত মনুষ্যত্বে পূর্ণ হউক।”—সঞ্জীবনী, ২৪এ শ্রাবণ, ১২৯২।

“ইহাতে দ্বাদশটি আর্য্য-মহিলার জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। যে কয়েকটি রমণীর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জীবনের অনেক মহত্ত্ব আছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গ-মহিলাগণ এই পুস্তকখানি পাঠে এ দেশীয় রমণীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি, শাসন-ক্ষমতা, দেশহিতৈষিতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণের অনেক দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিবেন।” বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৯২।

“মহতের চরিত্র মহত্ত্বপ্রদর্শনময়। কল্পিত চরিত্র পাঠাপেক্ষা প্রকৃত জীবনী পাঠে যে কত উপকার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা অধঃপতিত, তাই আমরা মহতের মহত্ত্ব বুঝি না, গৌরবময় জীবনের গৌরব অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর কোন স্থানে যদি বীরত্বের পূর্ণ-বিকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা ভারতেই হইয়াছে। ইতিহাস ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে; অহংমত্ত ইউরোপও ইহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছে। এ সকল কথা জানিতে, এ সকল কাহিনী শুনিতে বাঙ্গালীর যেন একটু একটু আগ্রহ হইতেছে। “আর্য্য-কীর্ত্তি” এখন গৃহে গৃহে পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। আবার আজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী ভারতের দ্বাদশ নারীর জীবন-কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়া বাঙ্গালীর হস্তে দিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ইহাতে তারাবাই, অহল্যা বাই দুর্গাবতী, বিহুলা প্রভৃতি নয়টি আর বঙ্গের রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি ও বেহুলা এই তিনটি রমণীরত্নের উজ্জ্বল কাহিনী অতি

উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।—দৈনিক, ১৩ই বৈশাখ, ১২৯২।

"ইহাতে কয়েকখানি সুন্দর ছবিও আছে। এই পুস্তকখানির লেখা অতি সুচি সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেক সারগর্ভ উপদেশও আছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, ইহা অল্পমতি বালকদিগের পাঠ্য-পুস্তক মধ্যে গণ্য হয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইহার মধ্যে না কি এই পুস্তকখানি রাজসাহী ও রঙ্গপুর বিভাগে চলিত হইয়াছে। আমরা শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি প্রেসিডেন্সী সার্কেল ও অন্যান্য বিভাগের পাঠ্য-পুস্তক মধ্যে গণ্য করেন।" ইত্যাদি।—সমাচার চন্দ্রিকা, ১০ই ভাদ্র, ১২৯২।

নির্ব্বাণ-জীবন।

"The poem before us has been composed on the model of Grey's "Elegy written in a Country Churchyard" The writer has thoroughly clothed it in an oriental garb, and in doing so, has shown great tact and ingenuity The production is creditable to the young poet"

The Indian Mirror, 12*th. February*. 1885

'It is a short Bengali poem containing some very beautiful lines"—*The Indian Nation, 27th October, 1885.*

"কবি গ্রে যে "এলিজি" লিখিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, নির্ব্বাণ-জীবন তাহারই ছায়া লইয়া রচিত। আমরা এ ছায়া দেখিয়া সুখী হইয়াছি। পুস্তকখানি কবির পাঠকদিগের বেশ পাঠোপযোগী হইয়াছে। ভাষা ভাব মার্জ্জিত, কল্পাগুলি সুন্দর

রূপে সাজান। দুর্গাদাস বাবুর একটি বিশেষ গুণ দেখিলাম যে, এলিজির মাঝে মাঝে যে স্থল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও প্রকৃত হইয়াছে। এরূপ অনুবাদ প্রায় আশা করা যায় না। আমরা নিম্নে নমুনা দেখাইলাম :—

"Full many a gem of purest ray serene.
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen,
And lost its sweetness on the desert air"

"অতল জলধি-গর্ভে গাঢ় নীল জলে,
দীপ্তিমান চুনী পান্না মণি কত জলে।
ডুবন্ত মরুভূ-মাঝে ফুল্ল ফুল-কুল,
বিস্তারি সুগন্ধ হয় বিচ্যুত-মুকুল। ইত্যাদি।"

প্রভাতী, ৩০এ ফাল্গুন, ১২৯১।

"নির্ব্বাণ-জীবন ইতিপূর্ব্বে আমাদের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া পূর্ব্বেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থকার যে অনিত্য মনুষ্য-জীবন চিনিতে পারিয়াছেন, জীবনের উৎপত্তি, জীবনের কর্ত্তব্য এবং জীবনের লয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা অধিকতর সুখী হইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, এই স্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির একটু পরিচয় দিই, কিন্তু একবার আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, বলিয়া তাঁহার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না।"—সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬এ চৈত্র, ১২৯১।

"আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি গ্রে-রচিত "Elegy written in a Country Churchyard" নামক মনোহর কবিতাটিকে ভাষান্তরিত করিয়া তাহার মৌলিক ভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আশা করি, গ্রন্থকার বিজ্ঞবয়সে অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিবেন।"—সঞ্জীবনী, ৯ই মাঘ, ১২৯২।

"ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। জীবনের নশ্বরতা ও পার্থিব বৈভবের অসারতা ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার স্থানে স্থানে কল্পনার লীলা ও সদ্ভাবের সমাবেশ আছে।" ইত্যাদি। —প্রবাহ, পৌষ, ১২৯২।

"নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও ভীত হন। কারণ, ইহাতে এত সূক্ষ্ম ও গূঢ় বিচার আছে যে, সচরাচর লোকে তাহার বিষয় লেখা দূরে থাকুক, তাহা ধারণা করিতেও অক্ষম। গ্রন্থকার তাঁহার কবিত্বের ও সবলতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে সামাজিক বিষয় সকল সরল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিয়া সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া সামাজিক কবি বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, গ্রন্থকার এরূপ কঠিন বিষয় লইয়া এতদূর চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।" ইত্যাদি। —সময়, ১৯শে কার্ত্তিক, ১২৯১।

"পুস্তকখানি একটি ক্ষুদ্র কবিতা—ইংরাজী কবি গ্রের বিখ্যাত 'এলিজি'র ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। রচনা উত্তম হইয়াছে—পাঠ করিতে করিতে হৃদয় মধ্যে বার্ত্ত

বিকই কবির অভিপ্রেত ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, যিনিই এই পদ্যটি পাঠ করিবেন, তিনিই সন্তুষ্ট হইবেন।"—পাক্ষিক সমালোচক, চৈত্র ১ম পক্ষ, ১২৯২।

ভারতে দুর্গোৎসব।

"This tiny pamphlet describes the Durga Pujah in its social aspects The sentiments embodied in it are free from the least taint of impurity; the production does credit to the young head from which we understand it proceeds"
The Indian Mirror, 30th April, 1884.

"ভগবতীর আগমনে লোকের মনের ভাব ও কার্য্যভাব কিরূপ হয়, গ্রন্থকার এই পুস্তকে কতকগুলি কবিতা দ্বারা তাহা চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ ভাবশুদ্ধ, সুশ্রাব্য অথচ স্বভাবসঙ্গত কাব্য বহির্গত হওয়া বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।—সময়, ২৩এ ফাল্গুন, ১২৯১।

"এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার সরসছন্দযে মধুর ভাষায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"
—শক্তি, ২৭এ ভাদ্র, ১২৯১।

"দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এখানি সে ধরণের নহে। ইহার লেখা বেস, সরল ও সুরুচিপূর্ণ।" ইত্যাদি।—সমাচার চন্দ্রিকা, ১২ই শ্রাবণ, ১২৯১।

শেষ বক্তব্য।

এ সকল ভিন্ন ও বাদশ নারী, নির্ব্বাণ-জীবন এবং ভারতে দুর্গোৎসবের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বিস্তর সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল প্রকাশ করিতে যাইলে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে পারে। বলা বাহুল্য এস্থলে স্থানাভাবে তাহার সকল প্রকাশিত হইল না।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।